যমুনোত্তরী হতে
গঙ্গোত্তরী ও গোমুখ

প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

ভট্টাচার্য্য সন্‌স্‌ লিমিটেড
১৮বি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

স্বর্গতঃ বন্ধুবর

মদনমোহন বর্ম্মন

আমার মধ্যজীবনে তোমাপেক্ষা নিকটতম আর কেহ ছিল না,—সর্ব্বস্থানে সকল ক্ষেত্রেই ভ্রমণের উৎসাহ দাতা তুমিই ছিলে,—তোমারই স্মরণে এই গ্রন্থখানি উৎসর্গ করলাম।

প্রমোদ

১৭ রসারোড সাউথ
টালীগঞ্জ, কলিকাতা

পর্য্যটক

এক

মুসুরী—ধরাসু—৪০ মাইল

সুখের হোক বা দুঃখেরই হোক পর্য্যটক জীবন বিচিত্র। আবার পর্য্যটনের ফলে যে অভিজ্ঞতা লাভ করা যায় তা বড় কম নয়;—কারো কারো জীবনে তা বড় সম্বল হয়ে থাকে। আমার মনে হয়, এই পবিত্র ভারতভূমির মধ্যে তীর্থস্থান বলে যেগুলি আছে, সেগুলির কিছুটাও যদি দেখা যায় তাহলে আমাদের মনে সহজেই এ ধারণা প্রবল হয়ে উঠে যে, সৌন্দর্য্যের উপাসক আমাদের পিতৃপুরুষেরা কি অসাধারণ উদার, লোক-কল্যাণের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ঐ স্থানগুলি তীর্থক্ষেত্র বোলে আবিষ্কার এবং চিহ্নিত করে গেছেন তাঁদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য। চিরশান্তির নিকেতন এই হিমালয় আজও আমাদের আনন্দের উৎস হয়ে আছে, এত দুঃখের মাঝেও।

আজ আমি মধ্য হিমালয়ের এমনই এক স্থানের কথা সংক্ষেপে বলচি যা পূর্ব্বে বেশি লোকে বলেননি। কারণ কষ্ট স্বীকার করে এই অঞ্চলে বেশি লোকে যাননি। রেলের ধারে তীর্থ ভ্রমণের ফলে সাধারণে আর পায়ে হেঁটে দুর্গম পথে যেতে চান না। হিমালয়ের যে দিকে খুব বেশি লোকে যাতায়াত করেন আমরা দেখতে পাই সে হোলো মহাপ্রস্থানের রাজপথে অবস্থিত কেদার, বদরিনারায়ণ প্রভৃতি তীর্থ। গঙ্গোত্তরী ও যমুনোত্তরীর পথে খুব কম লোকেই যাতায়াত করেন। পথটা সত্যই দুর্গম, বিশেষতঃ যমুনোত্তরীর দিকে। এ পথে সাধু, সন্ন্যাসী, তাপস ও পর্য্যটকেরাই যান।

যমুনোত্তরী ও গঙ্গোত্তরী যেতে হরিদ্বার ছেড়ে একেবারে মুসুরি থেকে যাওয়াই সুবিধা। এখানে খুঁটিয়ে ঐ দুইটি তীর্থের কথা না বোলে শুধু যমুনোত্তরীর কথাই বোলবো। কারণ, যমুনোত্তরীর বিবরণ সাধারণ পর্য্যটকগনের বৃত্তান্তে পাওয়া দুষ্কর।

মুসুরি থেকে প্রায় চল্লিশ মাইল দূরে ধরাসু গ্রাম। আমরা ধরাসুর পথেই যাই। সেটি উত্তর—পূর্ব্ব কোণাকুণি। মুসুরি থেকে ছয় মাইল সউয়াখালি,—চমৎকার

পথ, বেশি চড়াই-উৎরাই নেই। এ যাত্রায় আমার সাথী ছিল একজন সতীর্থ এবং কুলি। এখানে যে সতীর্থ একজনের কথা বলেছি, সে কলিকাতাবাসী যুবা বন্ধু সাথী ছিল, তার কথা বিশেষভাবে,—তন্ত্রাভিলাসীর সাধুসঙ্গের দ্বিতীয় ভাগে, পথের বিপত্তি নামক বৃত্তান্তের মধ্যে দেওয়া আছে তাই এখানে আর সেই কথার কাজ নাই। এখন সুধু বাহক-সঙ্গীর কথাই ভালো। সে ব্যক্তি এই গাড়োয়াল রাজ্যেরই লোক। খুব রাজভক্ত লোকটি।

মুসুরি থেকে প্রথম ছয় মাইল প্রায় সমতল পথ, সহজ আর অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ ভ্রমণ। তারপর ওখান থেকে **থাত্তুরহা** বা **থাত্তুরি** সেটাও প্রায় ছয় মাইল দূর। আর সারা পথটাই প্রায় উৎরাই। এই বারো মাইল আমরা প্রায় সাত ঘণ্টায় অতিক্রম করে এখানে দু'টায় পৌছলাম। তারপর এখানে ডাক-পিয়নের আড্ডায় সেই দিন ও রাত্রি কাটিয়ে পর দিন প্রাতে যাত্রা করে পাঁচ মাইলের মাথায় **মূলধারা** বোলে একটা জায়গায় এলাম। মূলধারার একটি ঝরনা মাত্র সম্বল বটে পথে আর লোকালয় দেখলাম না। এখানে কিছু জলযোগ করে আবার সাত মাইল চলে, তার মধ্যে প্রায় তিন মাইল চড়াই উঠে বাকি উৎরাই নেমে, **আঁধিয়ারি** গ্রামে এসে সেদিনের মতো বিশ্রাম করলাম। মধ্যে ধ্বস নেমে প্রায় খানিকটা গর্ত্ত হয়ে গিয়েছে—সেখান থেকে কতকটা নেমে আবার পথ তৈরি হয়ে গেছে লোকের পায়ে পায়ে—। যাই হোক এই আঁধিয়ারি থেকে আমরা পরদিন পাঁচ মাইলের মাথায় **তিয়ারহা** বোলে এক গ্রামে এলাম। এখান থেকে খালি খাড়া চড়াই একেবারে পাহাড়ের চূড়া পর্য্যন্ত,—চারিটি মাইল এই চড়াই! এতই কঠিন, যে ওপরে উঠে আর আমার নড়বার শক্তি ছিল না। বিকালে, আমরা আবার যাত্রা করে সাত মাইল উৎরাইয়ের পর মনের সুখে ধরাসুর বক্ষে এসে পড়লাম। এ পর্য্যন্ত মোটামুটি যেন এক নিঃশ্বাসেই পথের কথাটা বলেছি, বিশেষ ভাবে বর্ণনা কিছু করিনি। তার কারণ, আসল যমুনোত্তরীর পথের দুর্গমতা, আর তার, যথার্থ সৌন্দর্য্য বা মনোমুগ্ধকর যা-কিছু তা শেষের দিকেই অর্থাৎ এই ধরাসুর পর থেকেই। তা যথা-সময়েই বোলবো। এখন অবশ্য এ-পথে যাতায়াতের অনেক কিছু সুবিধাই হয়ে গেছে; কাঠের পাটা আর তার মাঝে মাঝে পাথর চাপা দিয়ে সেই পুরানো ধরনের সেতুর পরিবর্ত্তে অনেক জায়গায় কায়েমি লোহার ঝোলা পুল হয়ে গিয়েছে, সুখে গঙ্গা ও যমুনা উত্তীর্ণ হয়ে গন্তব্যের পানে যাওয়া যায়।

ধরাসু গ্রামখানি এ অঞ্চলে সমধিক প্রসিদ্ধ। এখান থেকে ভাগীরথীর তীরে তীরে একটি সোজা পথ উত্তর কাশী পর্য্যন্ত গিয়েছে,—যেখান দিয়ে পরে আমাদের গঙ্গোত্রী যেতে হবে। এখানে যে দৃশ্য তার তুলনা নাই। আমাদের গঙ্গার সঙ্গে মাত্র এক

যমুনোত্তরী
গঙ্গোত্তরী
দেবপ্রয়াগ
হরিদ্বার
গঙ্গা
যমুনা
টিহরী
উত্তরকাশী
গুপ্তকাশী
মসুরী
যমুনোত্তরী ও গঙ্গোত্তরী
পথের নকশা — ১৩২৩
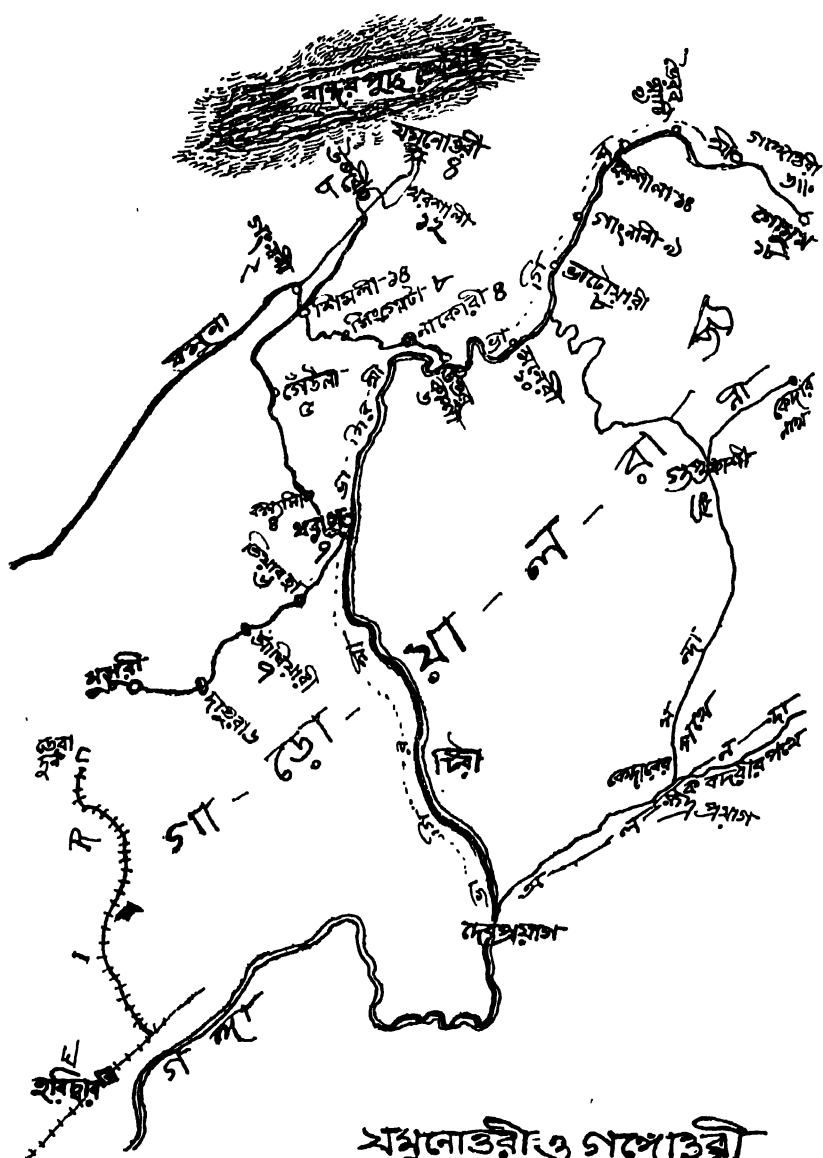
রাত্রির সম্বন্ধ। তারপর আর সম্বন্ধ রইলো না। আমরা অপর যে নদীটি এখানে পেলাম ভাগীরথীর সঙ্গে মিলেচে, তার নাম মূলধারা। এ একটি প্রয়াগ বললেই হয়। ধর্ম্মশালা তো আছেই। সারাক্ষণ কেটেছিল ভাগীরথীর সেই অপূর্ব্ব জলকল্লোল শুনতে শুনতে। এই ধর্ম্মশালার কাছেই টিহরি স্টেটের একটী বেশ বড় বাঙলো আছে। সেখানে স্টেটের ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টের কর্ম্মচারীরাই থাকে। সাহেব-সুবা বা কোন পর্য্যটনকারী এলে তাদের জন্য সুন্দর বাঙলোটি সদা প্রস্তুত। সেখান থেকে রূপ রসের আকর, যে-দৃশ্য—সৌন্দর্য্যের যে বিশালতা নয়নগোচর হয় তার তুলনা কি দিব। মনে হয় সারাদিন শুধুই বসে বসে দেখি। তারপর এই যে একটি ধারার সঙ্গে আর একটি ধারার যোগাযোগ,—একে বলে সঙ্গম বা প্রয়াগ। সে কি প্রবল জলোচ্ছাস। এই সঙ্গমই তীর্থ, আর তার খরতম বেগে একটি হাতী পড়লেও বোধ হয় তাকে যে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যাবে তার ঠিক নেই। উপরের জঙ্গল থেকে মোটা মোটা পাইনের রলা, আবার বড় বড় চেরা তক্তা কত ভাসিয়ে আনা হয়েচে এই স্রোতে।

ধরাসু গ্রামখানিতে প্রায় দেড়শো ঘর লোকের বাস। গাড়োয়াল স্টেটের প্রজারা বড়ই শান্ত প্রকৃতির, বেশিষ্ট্র ভাগই কৃষক শ্রেণীর.—তারা নেপালীদের মতো উদ্ধত নয়। এদের এই ভাল মানুষীর সঙ্গে একটু বোকা ভাব আছে। সেই সঙ্গে কতকটা অবিশ্বাস মিলে আমাদের ওপর তাদের ব্যবহারটা খুব ভাল হয়নি। তারা একটু লোভীও বটে। তারা ভেবেছিল আমাদের কাছ থেকে এই সুযোগে বেশ কিছু আদায় করতে পারবে খাদ্য দ্রব্য সরবরাহের ব্যাপারে। এদিকে আমরাও গরিব, যতটা সংক্ষেপে সম্ভব জিনিস-পত্র সংগ্রহ এবং খাওয়া-দাওয়া সেরে ফেলতেই অভ্যস্ত। সামান্য কিছু ঘি, আটা চাল, ডাল বা দই, এতে আর কতটুকু তারা সুখী হতে পারবে? মেয়েরা এখানে কি কঠিন পরিশ্রমই করে থাকে ঘরে ঘরে। আমাদের পল্লীগ্রামের শ্রমজীবীঘরের মেয়েরা যেমন পরিশ্রমী এরাও ঠিক তেমনি। এখানকার মেয়েরা ঘরের কাজ ছাড়াও ক্ষেতের কাজও করে।

এখানে দুইটি মন্দিরও আছে দেখলাম। হিমালয়ের মধ্যে বিশেষতঃ মধ্য হিমালয়ের ঐ মন্দিরগুলি স্থাপত্য অলঙ্কার বর্জ্জিত, নিতান্তই সাদাসিধা রকমের যেমন হয়, এখানকার শিব মন্দিরটি সেই ধরণের। এই মন্দিরটি একজন বানিয়া মহাজনের স্থাপিত। কতকটা শস্যক্ষেত্র উৎসর্গ করা আছে দেব সেবার জন্যই, তাই থেকে পূজারীর প্রাপ্য ও পূজার খরচ-চলে। পূজারী ভদ্র লোকের নিতান্ত কম আয়, তাইতে বড়ই দুঃখ আছে। আর এদিকে যাত্রী সমাগমও অল্প কাজেই বাইরের প্রণামী এবং পূজার দ্রব্যাদি আমদানী ঐ শিবরাত্রীর সময়ে যা কিছু দু পয়সা হয়। এখানে শক্তি মন্দিরও একটি আছে, নবরাত্রে এবং দীপন্বিতা চতুর্দ্দশী ও অমাবস্যায় সেখানে যাত্রী সমাগম হয়। জগদম্বার

মূর্ত্তি বলতে একখানি প্রায় চতুষ্কোণ পাথর, কোন কালে ভাস্করের হাতের পরশ পেয়েছিল হয়তো, এখন এমন ঘৃষ্ট অবস্থা, আর উপরে ঘন সিন্দুর প্রলেপে তার মূর্ত্তি

অন্য রকম হয়ে আছে। আমাদের ভারতে ভক্তি উদ্দীপনের পক্ষে এত সহজ উপায় আছে যা পৃথিবীর আর কোথাও নেই। আর যেমন আমাদের দেশে হয়ে থাকে,—

মেয়েরাই ধর্ম্ম কর্ম্মে, পূজা অর্চনায় অগ্রগামিনী, এখানেও তাই। তবে মানত করে পূজার ব্যবস্থাই এ দেশের নিয়ম। কারো ছেলে হয় না, বা হয়ে বাঁচেনা কিম্বা কারো অসুখ, অথবা ক্ষেত্রে এবার ধান বা গম পুরা হলে মানত থাকে পূজা দেবার। আমার সামনে এক কৃষক দম্পতি তার বড় ছেলেটিকে নিয়ে এসে পূজা দিয়ে গেল ঐ ছেলে দিল্লীতে চাকরি করতে গিয়েছিল, সশরীরে ফিরে এসেছে এখন,—মনস্কাম পূর্ণ হয়েছে পিতা মাতার। এই বার বিয়ের মানত বোধ হয়। এসব আমাদের ভারতীয় বিশেষত্ব, সর্ব্বত্রই আছে এই ভারত ভূমির মধ্যে।

এখানে ধানের ও গমের যত খেত দেখতে, বড় চমৎকার। পাহাড়ের গায়ে গায়ে কোথাও চওড়া কোথা সরু সিঁড়ির ধাপের মতো উঠে গেছে একেবারে উপর পর্য্যন্ত। চমৎকার আলের ব্যবস্থা, জল একটুও নষ্ট হয় না। ঝরনার জল নালি কেটে ক্ষেতের কাজ হয়, বৃষ্টির ভরসায় এখানে এরা কৃষিকর্ম্ম করে না।

দিনমানে যতটা সময় ছিল আমি একটুও অপব্যবহার করিনি। এখানকার যতকিছু দ্রষ্টব্য যতটা সম্ভব দেখেতো নিয়েই ছিলাম, আবার শুনেছিলামও অনেক। সন্ধ্যার পর ভাবলাম বেশ চাঁদিনীরাত, এমন জায়গায় এসে যদি খানিকটা গঙ্গাতীরে চন্দ্রমা-শোভিত সঙ্গমের উচ্ছ্বাস না দেখলাম তো কি ফল এখানে রাত্র যাপনের? তারপর সাধু বাহক বন্ধু, তাঁর নাম জনার্দ্দন, সন্ধ্যার পরেই যখন ধর্ম্মশালা হতে বেরিয়ে যান তখন আমায় এই বোলে গেলেন,—হাম্ আভি আতাহুঁ, সাহাব। যখন সে বেরুলো তখন আমিও র‍্যাপার খানি চড়িয়ে, মাথায় কান ঢাকা টৌপী পরে, লাঠিটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। মনের মধ্যে যখন একটা কৌতূহল একবার উদ্দীপ্ত হয়,—তাকে সামলানো দায়, একথা সবাই বুঝেন। আমার কৌতূহল একটা নয়,—সাধুসঙ্গ খোঁজা একটা দুর্ব্বলতা আমার বহু দিনই বিশেষ রোগে দাঁড়িয়েছে, একথা না বলাই ভালো।

প্রথমে গঙ্গা, অর্থাৎ এখানকার ভাগিরথীর কাছে নেমে গিয়ে খানিকটা তরঙ্গ ভঙ্গ দেখলাম। ক্রমে একটা নেশার মত আবেশ অনুভব করে সেখান থেকে সরে পড়লাম এবং ধীরে ধীরে পথের উপর শিব মন্দিরেই উপস্থিত হলাম। প্রাঙ্গণে এক কাঁড়ি কাঠ,—আর বারান্দায় দুই তিন জন সাধুমূর্ত্তি বসে বাক্যালাপে একেবারেই মসগুল। সেখানে গুটি গুটি গিয়ে দাঁড়ালাম।—তাদের নজরে যখন এসে গিয়েছি,—লক্ষ করলাম, সেখানে বেশ মৌজ চলচে, কারণ একজনের হাতে জলন্ত সরু চিলাম আর বাতাসে, চরস নামক মহাদ্রাবকের গন্ধ। বোধ হয় তারা ভেবেছিল আমি তাদের কাছে এখানে,—ঐ ধূমপান সম্পর্কেই মিলতে এসেছি;—তাই একজন বললে,—বৈঠ যাইয়ে সাধুজী। আমারতো সে উদ্দেশ্য ছিল না তাই, না বলেই জিজ্ঞাসা করলাম,—ইহাঁ কোই সাধু মহান্ত হোতে তো উনহিকো সাত মিলনে আয়াথা, কৃপাকর বাৎলা দিজিয়ে কিধার মিল সক্তা।

একজন, তাদের মধ্যে বললে,—ঘোড়া ঔর উপর যাইয়ে, বাঙ্গলা কোঠিকো পাশ রামগীর মহান্ত হোই; যদি মিল সিকো তো কাম পুরা হো যাই। হয়তো সহজ বুদ্ধিতেই তারা বুঝে থাকবে যে, নিশ্চয়ই আমার কোন কামনা আছে তাই সাধুর কাছে যেতে চাই, না হলে সাধুসঙ্গের কি দায় পড়েছে। হোক তাদের যা খুসী ধারণা আমার দিক থেকে এখন ডাকবাঙ্গলার নিকটবর্ত্তি হওয়ারই সার্থকতা বেশী। আগে থেকে স্থানটা দেখাই ছিল সুতরাং সেখান থেকে সেই দিকেই গেলাম এবং যখন বাঙ্গলার নিকটবর্ত্তি হয়েচি দেখি জ্যোৎস্নায় দিঙমণ্ডল ভরে গিয়েছে। রামগির বাবার আশ্রম, জিজ্ঞাসাই বা করি কার কাছে, এমন মানুষের খোঁজে চারিদিক দেখছি। কাকেও দেখতে না পেয়ে, বাঙ্গলার জমাদারের কাছে সোজা গিয়ে খবর নেওয়াই ঠিক, এই ভেবে আরও খানিক উঠে জমাদারের ঘরের পানেই গিয়ে দেখি, বাঙ্গলার মধ্যে অনেক লোক, আলো জলচে এবং কথাবার্ত্তায় হাসির হররায় তারা যথার্থই এমন ভাবে মগ্ন যে তার মধ্যে কারো অন্য দিকে লক্ষই নেই। অবশ্য লক্ষ্য করবার দরকারও ছিল না তাদের। আমি আরও নিকটে গেলে, বারান্দার নীচে একজনকে দেখলাম এবং তাকেই জমাদার স্থির করে মহান্তজীর পাতা জিজ্ঞাসা করে বসলাম।

সে ভদ্রব্যক্তি পাহাড়ী, যেন একটু সন্দিগ্ধ ভাবেই প্রশ্ন করলে, এই রাত্রে এমন সময় তাঁর পাতা চাইচি কেন। যখন তাকে বুঝাতে পারলাম যে, সাধুসঙ্গ কামনা ছাড়া আমার মত নগণ্য একজনের আর অন্য কোন উদ্দেশ্যই নাই এবং থাকতেও পারে না তখন, সে ব্যক্তি খানিকটা সঙ্গে এসে, সেইখান থেকে বাতলে দিলে ঠিক স্থানটা। সে চলে গেলে আমি আরও খানিক উঠে তারই কথামত বাঁ দিকে ঘুরে একটা গলি পথে ঢুকে গেলাম। সেখানেও খুব চাঁদের আলো, খানিক ঘুরে ফিরে একখানা পাথরের ঘর দেখলাম;— উপরের ছাদটাও ঢালু এবং পাৎলা পাথরের টালীতে ছাওয়া। খুব নীচু দরজা এমনই তার দৈর্ঘ্য যে একজন বেঁটে মানুষও সহজে ঢুকতে পারবে না। বন্ধ দরজাতে যে পাল্লা একটি, তাতে কারু কার্য্যও কিছু আছে, মাঝ বরাবর স্থানটায় এক প্রকাণ্ড পদ্ম, অসংখ্য তার পাপড়ি, খোদাই করা। এখন দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ, ভিতরে কোন সাড়া শব্দই নেই, মানুষের গলার আওয়াজ তো নয়ই; কাজেই তখন নিজেই সাড়া দিলাম,—বাবাজী, সন্তজী, বোলে। একবার দুবার ডাকতেই দরজা খুলে গেল। ঘরের মধ্যে যে আলো ছিল, তাইতেই দেখলাম, দরজা খুলে যে দাঁড়ালো আলোটা তার পিছন দিকেই সুতরাং তার মুখখানা স্পষ্ট দেখা গেলনা কেবল বুঝলাম,—ঘাগরা, কাঁচলী ও ওড়না পরিহিতা একটি কিশোরী অথবা যুবতী পার্ব্বত্য নারী। কোমল কণ্ঠস্বরে সে জিজ্ঞাসা করলে, ক্যা চাইয়ে? বোললাম, রামগির সন্ত বাবাকো পাশ আয়া, মুঝে দর্শন মাঙ্গতো হৈ। তখন সেই নারী বলে কি,—কাহে জী? কাজেই আমার সব কথা

খুলেই বললাম,—যমুনোত্তরীর যাত্রী, আজ এখানে যখন আছি সে সুযোগে সাধুসঙ্গ কামনা। ভাগ্যে যদি পাই তো সে সুযোগ ছাড়তে চাই না ইত্যাদি। শুনে, সে ভিতরে গিয়ে একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন আনলে এবং আলোটা তুলে আমার মুখখানা ভাল করে দেখে নিলে। তারপর বললে, সন্তজী আসনমে বৈঠা হৈ, অব দর্শন তো না হোই।

এখন যে আলোটা সে আমার মুখ দেখতে তুলেছিল, সেই আলোয় আমিও তার মুখখানি পরিষ্কার দেখে ফেললাম। আশ্চর্য্য হলাম ঐ যুবতীর অপূর্ব্ব রূপ মাধুর্য্য দেখে, এই জঙ্গলময় পার্ব্বত্য গ্রামে এতরূপ কেমন করে এলো। এই অসাধারণ রূপবতীকে সাধুর আশ্রমে দেখে আমার মনে যে সকল প্রশ্ন উঠতে আরম্ভ হোলো সে কথার আর কাজ নেই। যাই হোক আমি তখনই ফিরলাম না। আবার এক প্রশ্ন তাকে জিজ্ঞাসা করে বসলাম,—থোড়া বৈঠনেসে যদি দর্শন মিলে তো হাম্ বৈঠনোকো তৈয়ার হৈ। শুনেই সে তখনই আলো নিয়ে ভিতরে গেল এবং অবিলম্বেই ফিরে এসে চরম আঘাৎ হানলো এই বোলে যে, আজ রাতকো দর্শন না হো সকতে, কাল সুব কো আও।

এখন তো আমায় না ফিরে গেলেও নয়,—আর কোন উপায় নেই। কিন্তু ফিরবার আগে আরও একটা কথা জিজ্ঞাসা না করে পারলাম না;—কৃপা কর, মুঝে এক বাৎ ঔর বাৎলানা, মায়ীজি!

সদাশয় মায়ীজি, তৎক্ষণাৎ রাজী হলেন, ক্যা বাত? তখন জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়ে মহান্তজীকো কৌন দেশকী শরীর,—আপতো জরুর জানতি হৈ। তখনই মনে হোলো আমার কথাটী বুঝতে তার একটু সময় লাগলো। অবশেষে বললেন, কাশীজিসে আয়া বো সন্ত, বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ শরীর। অর্থাৎ কাশী থেকে এসেচেন এবং বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ শরীর তাঁর।

এখন যেই মাত্র শুনলাম বাঙ্গালী, তখন হঠাৎ একটা কথা মনে এলো;—তখনই আবার জিজ্ঞাসা করে বসলাম,—ময়নে পুছতা হুঁ কি, ইয়ে সন্তজী কৌন সম্প্রদায়, বৈষ্ণব, বেদান্তি; বো শাক্ত, কৌন পন্থী? উত্তরে শুনলেম, জীহাঁ, উনহোনে তান্ত্রিক, কৌল হৈ। তার পরেই আমার শেষ প্রশ্ন, আপ্‌নে উনিকো ভৈরবী হৈ, ক্যা? মাথাটি নীচু করে তিনি ধীরে উত্তর দিলেন,—জী, হাঁ। ব্যাস;—আর এক মুহূর্ত্তও দেরী না করে আমি ফিরলাম।

মাথাটা আমার কেমন গোলমাল হয়ে গেল, এ সব কি শুনলাম আর দেখলাম। একটা আঘাত এমন ভাবেই পেলাম যেন আমার কি একটা সর্ব্বনাশের ব্যাপার হয়ে গেছে। এমনই ভাবের পীড়িত অন্তর নিয়ে গুটি গুটি চলতে চলতে ধর্ম্মশালার পথেই আসছিলাম, কোনদিকেই লক্ষ্য ছিল না। যখন ডাকবাংলাটা পার হয়ে কতকটা

নেমে এসেছি তখন দেখলাম, একমাত্র কালো একখান কম্বল গায়ে জড়ানো, আধপাকা আধকাঁচা দীর্ঘচুল, গোঁফ দাড়ি, এক সাধুমূর্ত্তি, যেন কারো অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন, কতকটা আগে, আমার পথের ডানদিকে। তাঁর সুমুখ দিয়েই আমার পথ। কাজেই যেই মাত্র আমি তাঁহার কাছাকাছি এসেছি; ডান হাতটি তুলেই যেন আমায় দাঁড়াতে সঙ্কেত করলেন, তারপর তিনি আমার সামনে এগিয়ে এলেন, আমিও থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। জ্যোৎস্নালোকে পরিষ্কার তাঁর মুখ খানি দেখা গেল। দয়া মাখানো একখানি সুন্দর প্রৌঢ় বয়সের মুখ। তিনি বললেন,—

সাধু দর্শন নহি ভঁই? আমি বলিলাম, কৌন সা সাধু? তিনি বললেন, বো ভৈরবীবালা শাক্ত, কৌলপন্থী সাধু। বুঝলাম, আমি নিরাশা হয়ে এসেছি আর অন্তরে একটা দুঃখ পেয়েছি এ সব তিনি জানেন। তখন বললাম, জী হাঁ, মুঝে দর্শন তো মিলা নহি। তিনি এবার এগিয়ে চললেন পথের দিকে, আমিও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে একটু পিছন দিকেই আছি,—অথচ তাঁর মুখের দিকে লক্ষ্য আছে। তিনি বললেন,—বো সাধু তুমহারা দর্শন লায়েক নহি, ইয়ে সমঝকে উসিকো পাস ন' যানা। আচ্ছা সাধু, মনকি মাফীক সাধু দর্শন মিলেগা, সঙ্গভি মিলেগা, কুছ ফিকর মৎ করো,—আচ্ছা?

আমি শ্রদ্ধাবনত শিরে, আচ্ছা জী, বোলে তাঁকে নমস্কার করতে তাঁর পায়ের দিকে হাত বাড়িয়েছি—খানিক পিছনে হটে গিয়ে তিনি বললেন,—অব্ নহি, অব্ নহি,—যা বাচ্ছা, তেরা তীরথ পুরা হো যায়গো,—বোলেই একটু ফিরে দাঁড়ালেন; যেন ভেবে নিলেন এখন কোন দিকে যাবেন। তারপর কোন কথা না বোলে, পথেরই পাশে যে দিকে খানিক জঙ্গল ওপর দিকে উঠে গিয়েছে, সেই দিকেই গেলেন। কিন্তু দুচার পা চলে যেন সরু পথটি ধরে উঠবেন এমন ভাবে দাঁড়ালেন,—আশ্চর্য্য ব্যাপার! আর তাঁকে দেখলাম না আমার সামনেই তিনি যেন অদৃশ্য হয়ে গেলেন। সেখানে এমন কোন গাছের ব্যবধান নেই যাতে তাঁর ঐ দীর্ঘ শরীর ঢাকা পড়তে পারে। ছোট ছোট গাছের সন্নিবেশ, খুব বড় গাছ এককোমরের বেশী উঁচু নয়, কিন্তু অদ্ভুত ঐ সাধু;—আমার জ্ঞান, বুদ্ধি, এমন কি বাহ্য চেতনাকে স্তম্ভিত করে কোন দিকে, কোথায় তিনি অন্তর্দ্ধান করলেন তার মীমাংসা হোলো না। অবশ্য সরলবুদ্ধি আমার মত একজন ঐ ক্ষেত্রে যা করে আমিও তা করেছিলাম। খানিকটা এদিক ওদিক, উপরে নীচে বেশ করে খুঁজে প্রায় হায়রান হয়ে রাত্রে বাসায় ফিরে শয্যা গ্রহণ করলাম। ধরাস্থর এ স্মৃতি আজও আমার মধ্যে জীবন্ত আছে।

যখন ধরমশালায় এলাম তখন আমার সাথী জনার্দ্দনের কাছে যে এতটা জবাবদিহি করতে হবে তা অনুমানও করতে পারিনি। সে আমায় একেবারেই যেন পেয়ে বসলো,—কেন আমি রাত্রে এখান থেকে বেরিয়ে হেথা সেথা করে বেড়িয়েছি;—কোন

নারীর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল কিনা। এখানে যক্ষ, রক্ষ, কিন্নর, নানা ভূমির নরনারী রাত্রে বিচরণ করে, যদি বাগে পায় তো নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করিয়ে ছাড়বে।

আমি বললাম, আচ্ছা জি, যদি নারী না হয়ে নর-শরীর হয় তাহলে কি হবে?

তা হলে মন্দের ভালো, কারণ নর শরীর ধারী কেউ নর শরীরের উপর পীড়ন করে না। আর স্বজাতি ভেবে তারা কখনও অনিষ্ট করে না। যাই হোক কেউ আমাকে কাবু করতে পারে নি কারণ আমার গুরু বল ছিল,—গুরু আমার সহায় থাকতে কোন প্রকারে আমায় অধিকার করতে পারেনি যদিও আমার সঙ্গে এক অপ্সরার দেখা হয়েছিল। অতটা শুনবার পর জনার্দ্দন বিশ্বাস করলে সত্যই আমার সঙ্গে এক অপ্সরার দেখা হয়েছিল। আরও বিশ্বাস করলে সত্যই আমার গুরুবল আছে যে কারণে আমি কঠিন বিপদ থেকেও উদ্ধার পেতে পারি, যেহেতু গুরু আমার সঙ্গেই আছেন, থাকেন, বরাবর,—যেখানে আমি যাই।

দুই

গেঁউলা—উজরী—খরশালী—৪২ মাইল

পরদিন আমরা ভোরের সময় যাত্রা করলাম পূর্ব্বমুখে যমুনার দিকে। কতক পথ গিয়ে সামনে সামান্য চড়াই পেলাম প্রথমে,—তারপর সোজা পথ। সুন্দর এক পাইন বনের মধ্য দিয়ে পথ। মনের আনন্দেই চলেছি। প্রায় সাড়ে ছয় মাইল অতিক্রম করবার পর একটি ছোট ঝরনার ধারে বসে কিছু জলযোগ করে নেওয়া হলো, তখন বোধ হয় এগারোটা হবে। সামনের সুন্দর পর্ব্বতমালা দেখতে দেখতে তারপর পথ চলা শুরু হল আবার। এই ভাবে নয় মাইলের মাথায় **বরমখেলায়** পৌছে গেলাম। এর অপর নাম **গেঁউলা**। বেলা দু'টা নাগাদ আমরা পৌছে স্নানাহার সেরে নিলাম। গ্রামখানি ছোট কিন্তু বেশ ঘন বসতি। দোকানদার এক বানিয়ার আশ্রয়ে কোন প্রকারে সেই রাত্রি যাপন করে পরদিন গাংনানির পথে যমুনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। আজ কঠিন চড়াই-উৎরাই নিয়ে প্রায় ষোলো মাইলের মাথায় পড়াও। চড়াইটি বড় ভয়ঙ্কর লেগেছিল। চড়াইও যত উৎরাইও ঠিক ততই। এই চড়াই আর উৎরাই মিলিয়ে প্রায় আটটি ঘণ্টা হাঁটতে হোলো। অবশ্য উঠবার বেলা কয়েকবার কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতে অথবা দম নিতে হয়েছিল। এই ভাবে শেষ দশ মাইল পথ আজ হেঁটে—প্রায় পাঁচটা নাগাদ গাংনানিতে যমুনার তীরে পৌছলাম। এতটা তপস্যার পর তবে যমুনার দর্শন পাওয়া গেল। প্রাণে যে আনন্দ নিয়ে যমুনা দর্শন করলাম তা বলবার ভাষা নেই,—সেই কঠিন পথশ্রমের কথা আর মনেও রইলো না।

এখানে বাবা কমলিওয়ালার একটী ধর্ম্মশালা আছে, সেই খানেই আশ্রয় নিলাম। এখানে কয়েকটি দোকান, মুদি ও মনোহারীর দোকান তো আছেই তা ছাড়া গাড়োয়ালী দরজীর দোকানও আছে। আমাদের মতো বিদেশী তীর্থ-যাত্রীদের ওপর মেয়েরাও দয়া রাখে এদেশে। ঘোমটা-দেওয়া মেয়েরাও কলাটা-মূলাটা, কিছু শাকশব্জী নিয়ে হাজির হয় সাধু ভেবে। কেউ বা একটি পাত্রে খানিক দৈ নিয়ে এলো। সাধু-সন্ন্যাসীদের কাছে এদের প্রার্থনা থাকে কিছু কিছু, এ কথা আগে কথা প্রসঙ্গেই বোলেছিল. যথা ;—বয়স পেরিয়ে গেছে এখনও ভগবানের ফল পাওয়া যায়নি, কারো হয়তো ছেলের অসুখ ইত্যাদি—। তবে বানিয়া মেয়েদের ভিড়ই বেশি। ব্রাহ্মণ ছত্রিদের বড় একটা দেখিনি।

যমুনোত্তরী যাবার পথে এই যে গাঙ্গনানী এই স্থানটির কথা মনে থাকবে। সুধুই এ গ্রামবাসীদের আতিথ্যেব জন্য নয় আরও একটি কারণে। এমন রূপ, ছেলে মেয়ে থেকে যুবক যুবতি, প্রৌঢ় প্রৌঢ়ী, এমন কি বৃদ্ধ বৃদ্ধা পর্য্যন্ত যেন সবাই বিচিত্র একটা লাবণ্যে মণ্ডিত। সু-শ্রী, বোধ হয় প্রত্যেককেই বলা যায় এমনটি আগে কোথাও দেখিনি। ধরাসুতেও অবশ্য বেশ সুন্দর ও স্বাস্থ্যবান শরীর দেখেছি, সে আর একরকম, একেবারেই অন্য প্রকারের। গ্রামে প্রবেশ করে প্রথমেই একজন চাষীকে দেখলাম। প্রায় বৃদ্ধ, কিন্তু সেই রক্তাভ গৌরবর্ণের সঙ্গে তার দাঁত পড়া মুখের এমন সুন্দর মিল আর মুখশ্রী তার এমনই চমৎকার, দেখলে ইচ্ছা হয় আলাপ করি। এ পথে, গাংনানী গ্রাম দেখেই আমার একটা বিশেষ ধারণা এই হয়েছে যে সহরে বা নগরে রূপের তুলনায়, স্বাস্থ্য ও রূপের উৎপত্তি গ্রামের মধ্যেই বেশী।

আর একটা বিশেষ ব্যাপার, এই গ্রামের সম্পর্কে, এরা বলে, যতটা কৃষিক্ষেত্র এই গ্রামের অধিকারে আছে সেই সকল ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা এত বেশী এবং সেই হেতু উঁচু স্তরের ফসল এতটা হয়, এই যমুনা তীরস্থ আর কোন স্থানে এতটা সুন্দর এবং প্রচুর ফসল হয় না। জানিনা জমির উর্ব্বরতার সঙ্গে স্থানীয় স্বাস্থ্য এবং শ্রীর কোন প্রকার সম্বন্ধ আছে কিনা। তবে এটা সত্য যে এই ক্ষেত্রে জমির উর্ব্বরতা এবং স্থানীয় অধিবাসী নর নারী, বালক বালিকার স্বাস্থ্য একধারায় মিলে গিয়েছিল। এখানকার বণিক পরিবার একটি এবং ব্রাহ্মণ পরিবার একটি। বিশেষ করে দুই সংসারের আচার ব্যবহার এবং অবস্থা এবং সংস্থান অতিথি ভাবে সদালাপের দ্বারাই দেখেছি, কোন পার্থক্য দেখেনি। ব্রাহ্মণদের যেমন জনৌ, বৈশ্যদেরও ঠিক সেইরূপ গোত্রপ্রবর অনুসারে জনৌ আছে। বৈশ্য গৃহে ব্রাহ্মণ পাক্কি ভোজন করে যেমন বৈশ্যেরা ব্রাহ্মণগৃহে পাক্কি খায়। কোন শ্রেণী কোথাও নিজ গৃহ ব্যতিত কাচ্চি খায়না।

সুন্দর যুবা, চুড়িদার পাজামা তার উপরে একটা ঝোলা সার্ট পরে মাথায় সাদা টুপি,—আমাদের কাছে ঐ ধর্ম্মশালায় এসে বসলো। কোন কথাই প্রথমে ছেলেটি কইলেনা। বয়স তার উনিশ কুড়ি হবে, এলোখেলো কোঁকড়ানো চুলের বোঝা মাথায়, খানিকক্ষণ বসে আমাদের দেখলে। সেখানে আমি ছাড়া আরও দুই তিন জন যমুনোত্তরী ফেরৎ যাত্রী ছিল; তার মধ্যে এক পাঞ্জাবী প্রৌঢ় ব্যক্তিও ছিল। সে কি জন্য হঠাৎ এসে বসলো আমরা কেউ তা বুঝতে পারিনি,—তাই প্রথমে আমিই জিজ্ঞাসা করলাম, তুমনে, এ গাঁওকী রহনেবালা ক্যা? সে বেচারা একটু খতমত খেয়ে গেল প্রশ্নটায়,—একটু সামলে নিয়ে বললে, হামারা পিতাজি বিমার পড় রহা, অব সোচতে কাইকো পাস কুছ জড়ি বুটি হো তো খিলায় দে।

এ এক অদ্ভুত কথা, বাপের অসুখ,—কি অসুখ তার ঠিক নেই, কে জড়ি বুটি দিবে? পাঞ্জাবী ভদ্র লোকটি জিজ্ঞাসা করলে, -ক্যা বিমার— ? —সে বোললে বুখার, তিন রোজ, বহোৎ, আভিতক ছুটা নাই। তখন সেই ব্যক্তি বললে, চলতো দেখি কৈসি বুখার। বলে তার সঙ্গে চলে গেলো; আমরা কেউ গেলাম না। প্রায় এক ঘণ্টা পর যখন তিনি ফিরলেন, জিজ্ঞাসা করলাম কি ব্যাপার? তিনি বললেন, মেনিনজাইটিস বোলেই মনে হোলো, এখানে তো চিকিৎসা হবেনা, নেচার থেকে আপনি যদি বাঁচে, না হলে কোন উপায় নেই। জিজ্ঞাসা করলাম আপনি ডাক্তার? তিনি বোললেন, তাই বটে, তা ছাড়া এ অঞ্চলে কি ভাবের অসুখ বিসুখ হয় সেই অনুসন্ধানেই এসেছি। তখন জিজ্ঞাসা করলাম, ডাক বাঙ্গলায় না উঠে এই কমলী-বালার ধর্ম্মশালায় উঠলেন কেন? তিনি বললেন এখানে থাকলে সাধারণের সঙ্গে মেলামেশায় সুবিধা আছে জানা শোনা সহজেই হয়ে যায়। এই দেখুন না, যদি আজ ঐ ডাকবাঙ্গলায় থাকতাম তা হলে এ ছেলেটি কি ওখানে যেতে সাহস করতো? না সেখানে যাবার কথা কখনও মনে করতো? আমি বললাম, এখন কি উপায় হবে বেচারার?

তিনি বললেন আমি হাতে নিয়েছি বটে কিন্তু এখানে তো ইনজেকসান পাওয়া যাবে না। আর আমাদের অন্য ঔষধ তো নেই। আমরা যখন কথা কয়ে চলেছিলাম, তখন সেই ছেলেটি আবার এলো, এসেই বেচারা কোনদিকে না দেখে ডাক্তার সাহেবের কাছে জিজ্ঞাসা করলে আপনে ডাকডার সাহেব, আপনে কুছ দাবা তো বাৎলায়া নহি?

ডাক্তার বললে, —ক্যা দাবা ব্যাৎলাউঁ, খিলাওগে কিস্‌তরে, হাসপাতাল হোতা তো সব বন্দোবস্ত ঠিক হো যাতে ইসি মাফক 'গাওমে হাম্ ক্যা করসেকতে? অব্ বাৎলাওনা তুম। ছেলেটি তখন কাতর হয়ে হাত দুটি জোড় করে, বাচাইয়ে ডাকতার সাব, হামারা পিতা কো, বলিয়াই পায়ে ধরতে গেল। তখন ডাক্তার খানিকটা পিছে হটে

এবং একটু ধমকের স্বরে তাকে বললে, আরে তু আহম্মক্, নহি সমঝতে, ইহাঁ ক্যা হো সকতা ? —ছেলেটি জোড় হাতে আরও কাতর কণ্ঠে বললে, আপ তো লায়েক আদমী, আপ ক্যা নহি করসকতা ? তাহার চক্ষে জল, টপ্ টপ্ করে তখন ঝরচে। তার কথা শুনে, ডাক্তার আবার বললে, ইয়ে অবস্থামে মুঝ কো না লায়েকই সমঝো।

আমার বাহক বন্ধু জনার্দ্দন তখন শুয়েছিল, উঠে বসলো, তার সামনে বালকটির অশ্রু বিগলিত অবস্থায় দেখে বললে, বো আঁংরেজী ডাঁকটার হো, ইস সে কুছ কাম না হোই, চলোতো দেখু, ইধার ঔর কোই লায়েক হৈকি নহি। আর কোন দিকে না তাকিয়ে, বালকটির হাত ধরে তারপর দ্রুত পদে বেরিয়ে গেল।

আমার কৌতূহল একটু বিশেষ ভাবেই চাপ দিল আমিও উঠলাম এবং তাদের অনুসরণ করলাম। ধর্ম্মশালার বাইরে এসেই সে যমুনাতীরে যেখানে একটি ছোট্ট শিবমন্দির আছে, তার কিছু দূরে ঝোপ ঝাড়ে ঢাকা এবং একটি বড় গাছের পাশেই ছোট গুহা আছে, সেখানে এক ভস্মমাখা অঙ্গ, জটা জুট সমন্বিত শীর্ণকায় বৃদ্ধ সাধু, চিলাম ফুঁকছিল, তার কাছে এসে প্রণাম করলে। সাধু হাত তুলে, জয় হো, বোলে আশীর্ব্বাদও করলে, শেষে ছিলামটাতে আরও একটু তীক্ষ্ণ টান দিয়ে কাসতে আর ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে জনার্দ্দনের হাতে দিলে। দেখলাম জনার্দ্দনও দিব্য বসে গেল টানতে এবং প্রসাদটি বড় কম শব্দ কোরে খেলেনা, শেষে চিলামটাকে উবুড় করে কানিশুদ্ধ রেখে দিয়ে বললে, এক দফা তো উঠনে হোই, বাবা শম্ভুনাথ।

বাবা বোললে. আসন ছোড়কে কৈসি উঁঠু ? কহো, জি, কাঁহা লে চলোগে ?

ইস্ বাচ্চাকো পিতাজী তো বড়ি বীমার পড়ি বাবা, কৃপা করো। ইয়ে নজিক উনহিকো ঘর হৈ, কুছ দুঃখ নহি হোয়গা বাবা, জানতো বাচানা—

আরে গাঁওয়ার, ম্যায় ক্যা জান্ বাচাউ, জান তো শঙ্কর বাচায়েগা, মইনে জান তো ন-মার সকতি ন-বাঁচা সকতি। এই কথার পর জনার্দ্দন, তখনি উঠে দাঁড়ালো,—তারপর সে, দুই বাহু প্রসারিত করে এগিয়ে সাধুর কাছে গিয়েই তাকে পাঁজাকোলা করে তুলে ফেললে, বললে, তব তো হাম আপকো বহ লে চলুঙ্গী। তারপর ছেলেটিকে, চল্ তো, তুমহারা ঘরকি রাহতা দেখলাও, বলে—চললো পথের দিকে। জনার্দ্দন এমনই ভাবে তাকে কায়দা করে নিয়ে চললো বৃদ্ধের কিছুই লাগেনি, বেশ আরামেই ছিল সে তার কোলে। বুড়ো কেবল বললে, আরে বাবা, শঙ্করনাথ! ইয়ে ডাকু, হো দেখো, মুঝকো কঁহা লে যাতে। অব্ তুম জানো, ময় কুছ নহি জানতি বাবা, ব্যোম, শঙ্কর, শিউ শঙ্কর ভোলা, মহেশ্বর, ইত্যাদি।

গাঁওয়ার জনার্দ্দন, সাথে সেই বালকটি আগে হন্ হন্ করে অনেকটা উঠানামা শেষে পৌছলো তাদের ঘরে। একটা গলির মধ্যে সারি সারি পাঁচ ছয় খান ঘর,

তার মাঝে বরাবর একখানাতে পৌছে সে, ছেলেটিকে বললে, চল কাঁহা তেরে পিতাজি। সামনেই ঘরের ভিতর ঢুকে বললে, এক আসন তো দে। একখানা কম্বলের মোটা আসন দিলে পেতে একটি মেয়ে, তার উপর সে সেই সাধুকে দিলে বসিয়ে। তারপর জনার্দ্দন তার পা দুখানিতে নিজের মাথা ঘসতে আরম্ভ করলে, মুখে কোন কথা নেই। তখন সেই সাধু ধীরে ধীরে তাকে মাথায় হাতটি দিয়ে বললে, যা যা, অব্ বোল, কাহে শঙ্করজীনে হামকো ইহা লায়া,—বাৎলা, জলদি!

একখানা খাটে আপাদ মস্তক একখানা মোটা কম্বলে মুড়ি দেওয়া এক শয্যাশায়ী মূর্ত্তিকে দেখিয়ে ছেলেটি বোললে, বো হো মেরে পিতাজি, আজ তিন রোজ বড়ি বিমার পড়ি; কোই হোস্ নহি, আঁক খুলি নহি, খানা পিনা কুছ নহি, বুখার চড়রহা অভিতক উতারাভি নহি, জি মহারাজ।

তখন সাধু ধীরে ধীরে কাছে গিয়ে রোগীর কপালে তাঁর ডান হাতটি বুলোতে লাগলেন, সঙ্গে সঙ্গে বলতে লাগলেন, বাচ্চা, আঁখ তো খোল, বাচ্চা, আঁখ তো খোল দে। আশ্চর্য্য ব্যাপার, ঐ বলার সঙ্গে সঙ্গে রোগী চক্ষু খুললে, টক টকে লাল চক্ষে, সামনে সাধুর মুখ পানে চেয়ে রইলো। তখন সাধু-বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, ক্যা তকলিফ হৈ, মেরে বাচ্চা? রোগী মাথায় হাত দিয়ে দেখালো যে, মাথায় বড় যন্ত্রনা। তখন ঐ বৃদ্ধ, ছেলের পানে চেয়ে বললেন, শ্রী ফল কা কাঁটে দোচার মুঝে লায় দো, বাবা। সে তৎক্ষণাৎ চলে গেল এবং পাঁচ মিনিটের মধ্যে মোটা মোটা বেল কাঁটা নিয়ে এসে সাধুর হাতে দিল। তিনি ঐ গুলি নিয়ে রোগীর শয্যা পাশে ঘেঁসে গিয়ে বসলেন এবং জনার্দ্দনকে ডাকলেন কাছে, বললেন, জোর সে উনকে, শির পাকড়ো, যৈসে ইধার উধার না হোনেসিকে। তারপর মেয়েদের ঘর থেকে বার করে দেওয়া হলো। ছেলেটিকে কাছে ডেকে কি যেন একটা বললেন। তারপর রোগীর ঘাড়ের কাছে হাত বুলাতে বুলাতে ঐ মোটা বেল কাঁটা নিয়ে একেবারে গভীর করে ফুঁড়ে দিলেন একটা বিশেষ স্থানে, সঙ্গে সঙ্গে ফিনকী দিয়ে রক্ত আরম্ভ হোলো, তাতে তিনি যা বললেন, তার ভাবার্থ এই যে, রক্ত বার হতে চায় বার হয়ে যাক, যখন আপনি বন্ধ হয়ে যাবে তখনই রোগী সেরে যাবে; কিছু ভয় নেই। তারপর জনার্দ্দনকে বললেন, অব বাবা-শঙ্কর নাথ, লেতো চলো, ফির আপনা আসন পর পৌছাও, আও মেরে বাচ্চা।

আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, পরদিন যখন গাজনানী ছেড়ে যাচ্ছি, রোগীর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, জনার্দ্দন বললে, ক্যা সাউকার! অব কৈসা মালুম হোতে?

সাউকার বোললে, কাল সন্ধ্যাসে শিরকা সব দরদ উতার গেই, অব বহুত আচ্ছা মালুম হো রহা। সাধু সন্তকী কৃপা। জনার্দ্দন বোললে, নহি জি, শিউ শঙ্করজিকো দয়া বোলো, ঔর কোই কো কুছ নহি।

পরদিন প্রভাতেই আবার যাত্রা সুরু হোলো। আজ ন'মাইলের পথ। উজরি গ্রামে পৌঁছাবার আগে একটা মাইল খানেকের চড়াই ভাঙতে হয়েছিল। তারপর উৎরাইয়ের মাঝেই এই উজরি গ্রামখানি। আমরা যখন উপস্থিত হলাম তখন বেলা একটা হবে। এখানকার লোকগুলি ভালমানুষ, সরল আর অলস। এসে বসলে আর উঠতে চায় না। যমুনোত্তরী কঠিন তীর্থ,—বন-জঙ্গল ভেঙে যেতে হবে, পথ দেখা যাবে না, তারপর শেষদিকে উৎকট চড়াই আছে। এসব আমাদের জানা কথা যে, এ-দিকে যাতায়াত কম বোলে সঙ্গে একজন এদেশের লোক দরকার,—যমুনোত্তরী যেতে আমাদের **খরশালি** থেকেই গাইড বা পাণ্ডা বা সহায় ঠিক করে নিতে হবে,—ইত্যাদি। একজন বানিয়া তার ঘরে রাত্রে আশ্রয় দিলে, অবশ্য তার দোকান থেকেই যা কিছু দরকার কেনা হয়েছিল। আমি ভিতরে আর আমার বাহক বারান্দায় রাত্রি যাপন করে প্রভাতেই আবার যাত্রা শুরু করা গেল। এবার খরশালি।

পথের প্রথম আড়াই মাইল ক্রমোচ্চ সুন্দর রাস্তা—কঠিন চড়াই নয়। মহা আনন্দেই চলেচি। তারপর চড়াই আরম্ভ—মাইল খানেক উঠে তারপর মাইল খানেক একটু উৎরাই। এই উৎরাইএর শেষে পর্ব্বতের পাদমূলে আবার নির্ম্মলা যমুনার দেখা পাওয়া গেল। একটি কাঠের পুল দিয়ে পার হ'য়ে গেলাম। তারপর আবার চড়াই শুরু হোলো! আমরা বেশ বুঝতে পারছিলাম ক্রমে ক্রমে উঁচুতেই উঠচি। আজকার পথের মাঝে চড়াই-এর তুলনায় উৎরাই কম। **রানাচটি** বোলে একখানা পাহাড়ী গ্রাম পেরিয়ে এলাম। প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ ঘর লোকের বাস এই গ্রামখানিতে। কাঠের বাড়ী,—যেমন এই গাড়োয়াল রাজ্যে হয়ে থাকে সেই রকমই সব মকান। এখানে জলযোগ এবং কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর—আবার চড়াই উঠতে সুরু করলাম। তারপর খানিক নেমে একটি ধারার কাছে এলাম। এই ধারার ওপর একটি পুল পার হয়ে হনুমানচটি। মনে করেছিলাম নিশ্চিৎ এবার পড়াওতে এসেছি; এই বুঝি খরশালি। কিন্তু মরুব্বি বাহক আমার বললেন, এখানে নয়। এখনও চড়াই আছে কতকটা, বৈঠিয়ে মৎ, চলিয়ে। খানিক প্রায়-সমতল ভূমি পার হয়ে আবার খানিক চড়াই শুরু হোলো। এই হনুমানচটি থেকেই বন-জঙ্গলের ভিতর দিয়ে পথ। প্রায় আড়াই মাইল বন পেরিয়ে ফাঁকায় এসে সামনেই নদীর ওপারে দেখা গেল একখানা গ্রাম। ভেবেছিলাম এই বুঝি খরশালি। কিন্তু এবারও নিরাশ;—বাহকবাবাজী বললেন, আরও একক্রোশ গেলে ঐ পাহাড়ের পিছনে খরশালি। কিন্তু সেই পিছনের পিছনে অনেক কিছু আছে। একটা বাঁকের মুখে দাঁড়িয়ে ঝরনা দেখতে পেলাম। সে ঝরনা পার হবার একটি সেতু রয়েছে,—সেইটি পেরিয়ে আমরা দেখি, পাহাড়ের পাদমূল থেকে নোড়ানুড়িতে ভরা একটি পাকডাণ্ডি উঠেচে। সেই পাকডাণ্ডি প্রান্তে

আমাদের গন্তব্য গ্রাম যার নাম—খরশালি। এই খরশালির যমুনা অত্যন্ত প্রখরা। যমুনা অনেকটাই নিচে কিন্তু গর্জ্জন শোনা যায়। এককালে একটা ঝরনা এই পথে যমুনায় গিয়ে পড়েছিল। এখন সেইটিই হয়েচে খরশালির পাকডাণ্ডীর পথ। কতকটা সমতল, যাকে বলে রিজ স্কন্ধদেশ সেই খানেই খরশালির গ্রাম। বেশ বড় গ্রাম। পাহাড়ী মকান যেমন হয়ে থাকে—এদিকে সবই কাঠের দ্বিতল বাড়ি, একতলই বেশী। একটি মাত্র দরজা আর কোন ছিদ্র নেই,—গবাক্ষ চুলোয় যাক। সারি সারি ঘর, নিচে মুদি, মনোহারী দোকান, আর ওপরে বাস করার জন্য কুঠ্‌রি। ভিতরে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে হয়, তার বর্ণনা না করাই ভালো। আমাদের দেশের কাকেও তার ওপরে উঠতে গেলে ভাবনায় পড়তে হবে হয়তো কিন্তু এরা সবাই অতি সহজেই ওঠানামা করচে—মেয়ে ছেলেরা পর্য্যন্ত।

এখানে ধর্ম্মশালা ও মন্দির, এই দুটি স্থানেই একটু বেশি লোকের যাতায়াত। মন্দিরে গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতী এই তিনটি মূর্ত্তি—কিন্তু কারো সাধ্য নেই যে, নিজ বুদ্ধিতে বোলবে কোনটা কার।

এই অঞ্চলে মূর্ত্তির কোন বিশেষ লক্ষণ বা গঠন পারিপাট্যের বালাই নেই,আসলে একটি প্রাচীন পাথরে কিছু খোদাই কালের প্রভাবে ক্ষয় হয়ে এসেছে এমনই একটি বস্তু। তার উপর কোথাও তেল আর সিন্দুর লেপে দেওয়া বেশ ঘন করে, তাইতেই আমাদের দেব বা ঈশ্বর উদ্দীপনের কোন ব্যাঘাত হয় না। অন্য ক্ষেত্রে ঐ মূর্ত্তির মুখখানি সোনা বা রূপার তৈরী মুকসের মত লাগানো থাকে, তাতে পুরুষ কিম্বা নারি নির্দ্ধারিত হয় কারণ তার উপরে নাক, মুখ, চক্ষু অর্থাৎ ত্রি নয়ন আঁকা থাকে। খানিক চুলের আকারও থাকে তার উপর মুকুট। তার পর গলা থেকে পা অথবা সিংহাসনের নীচে পর্য্যন্ত সবটা এমন ভাবেই ঢাকা যার জন্য কোন জিজ্ঞাসার অবকাশ থাকে না,—কেবল পুরুষের পোষাক আর প্রকৃতি বা নারী দেবতার শাড়ি পরিধানের বৈচিত্র্যটুকুই যথেষ্ট। তারপর দুই পাশ এবং নীচে দিকে সাজানোর ঘটা, দেব দেবীর উদ্দীপনা না এনে পারে না ধর্ম্মপ্রাণ যাত্রীদের প্রাণে। অর্থ নীতির দিক থেকে যতটা আবার শিক্ষা ব্যবস্থা নীতির দিক থেকেও ততটাই চিত্তাকর্ষক বিষয় তো বটেই। মোট কথা বিশাল এই হিমালয় গিরি রাজের অনন্ত পাষান আশ্রয়ে ভাস্কর্য্য কলার উৎপত্তি বিশেষতঃ কাশ্মীর থেকে আরম্ভ করে আসাম পর্য্যন্ত এই বিশাল ক্ষেত্রের দারু শিল্পের মধ্যে দিয়ে যে আশ্চর্য্য বিকাশ বহু প্রাচীন কাল থেকে হয়ে এসেছিল, সম্ভবতঃ সেধারা বন্ধ হয় নি। কিন্তু পাথরের কাজ যা ভাস্কর্য্য কলার দৃঢ় উপাদান তা তেমন ভাবে এ অঞ্চলে বিকশিত হয় নি। কিন্তু পাঞ্জাবের উপরের দিকে গান্ধারে অজস্র সৃষ্টি হয়ে গেছে।

ওকথা থাক এখন, আমাদের এই দেবী মূর্ত্তি যদি কেউ সত্য দেখতে চান, তাহলে

তাঁকে মন্দিরের বাইরে আসতে হবে। এখন এটুকু সহজেই সাধারণের মনে আসে বোলেই বলচি, মন্দিরে ঢুকবে কারা? যাদের পূজারী-সংগৃহীত ঐ মূর্ত্তি, ঐ পরিবেশের সঙ্গে একতা প্রকৃতিগত অথবা কামনার আন্তরিক সম্বন্ধ আছে। সম্বন্ধ সুধু নয় যথার্থ আকর্ষণ আছে বোললেই কথাটা ঠিক বলা হয়। তার টানেই ভিতরের সব কিছুই মধুর হয়ে যায়, মন্দিরের ভিত্তি থেকে চূড়ার কলস ও পতাকাটি পর্য্যন্ত সম্পর্কে সত্য, আর মন্দির শীর্ষে যদি কোন স্তম্ভ বা শূল পোতা থাকে দেখা যায় সে সম্পর্কেও সত্য। কারো কারো এ ধারণাও আছে, এতটা কঠিন পথ অতিক্রম, এতটা দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্খা নিয়ে জন্মভূমি থেকে এত দূর এসে যদি এক দৃঢ় প্রতিষ্টিত বিষয় বস্তু না দেখা যায় তাহলে আমাদের স্থূল মনটা যে ফাঁকা শূন্য হয়ে যায়; সে ফাঁক কি দিয়ে ভরানো যাবে? ঐ স্থূল সমষ্টিগত মনের পূর্ণতা আনার জন্যই মূর্ত্তি বা মন্দির এখানে থাকার সার্থকতা। একথা তিনিই বুঝবেন আর মর্ম্মে মর্ম্মেই বুঝবেন যিনি সত্য সত্যই মন্দির থেকে বাইরে এসে দাঁড়িয়ে দশ দিকে লক্ষ্য করবেন। এর পর বর্ণনা?—আর নয়। ধর্ম্মশালাটি বেশ প্রশস্ত। প্রাঙ্গণের তিন দিকে ঘর দ্বার, মধ্যে আচ্ছাদিত চাতাল, তার ওপর একটা বেশ মোটা কাঠের গুঁড়ি জ্বলে সর্ব্বক্ষণ দেখা যায়। এখানে যমুনার কল্লোল শব্দ আর কাঠের আগুনের ধোঁয়া ও জ্বলন্ত পাইন কাঠের গন্ধ সর্ব্বক্ষণের সাথী প্রত্যেক যাত্রীর। যা হোক এই খরশালিই শেষ চটি বা পড়াও,—এখানেই যমুনোত্তরীর জন্য সব কিছুই সংগ্রহ করে নিয়ে যেতে এবং তীর্থ যাত্রা সফল করতে হয়। তারপর পাণ্ডাদের জ্বালাতনের কথাটা বাদ দিলাম;—কারণ সেটা হিন্দুতীর্থের একটা ধর্ম্ম। মোটকথা যমুনোত্তরীর যাত্রী যাঁরা, এইখানেই তাঁদের পানভোজন রাত্রি-যাপনের একমাত্র আশ্রয়। দিনে দিনে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে যমুনোত্তরী দর্শনাদি করে এই খানেই ফিরে আসতে হয়। কারণ সেটা তুষার-রাজ্য সেখানে কোন লোকালয় নেই। কেউ সেখানে থাকে না, একমাত্র পূজারী ছাড়া। শীত এখানে দারুণ।

তিন

যমুনোত্তরী—৪ মাইল

যাই হোক, এখন যদিও ভাদ্র মাস কিন্তু এখানে ঠিক যেন প্রবল মাঘের শীতের মত রাতটি কোন রকমে খরশালির ধর্ম্মশালায় কাটিয়ে আমরা কয়েকজন যাত্রী সকালে রোদ উঠলে পর যাত্রা করলাম,—মহাতীর্থের পথে। চার মাইল পথ, মাত্র কিন্তু কি কঠিন পথ। এটুকু যাঁরা এসেছেন তাঁরাই জানেন। শেষের দিকে, এক মাইল চড়াই, তা পেরিয়ে বেলা দশটা নাগাদ পর্ব্বত-শিখরে একটি গাছের তলায় বসে হাঁফাতে শুরু করে

দিলাম। আকাশে মেঘ ছিল, তারপর ক্রমে তুষার পাত শুরু হোলো। দেখতে দেখতে ধোনা তুলো দিয়ে যেন গাছপালা সব কিছুই ঢেকে দিলে। সুইজারল্যাণ্ডের ছবিতে অনেকেই এটা দেখেছেন; ভারতীয় কারো কাছে এ দৃশ্য দুর্লভ। আর কত দূর? জিজ্ঞাসার উত্তরে বাহকবন্ধু বললেন, এবার উৎরাই, আর উৎরাইয়ের শেষেই যমুনোত্তরী।

প্রায় এগারো হাজার ফিটের (সমুদ্রতল হিসাবে) ওপর যমুনোত্তরীর মন্দির। অত্যন্ত ক্লান্ত, প্রায় অসাড় দেহ নিয়ে কোন রকমে গিয়ে পৌছলাম ধর্ম্মশালার মধ্যে। কেউ যেন না মনে করেন সোজা উৎরাই শেষেই যমুনোত্তরী। পাহাড়ের মাথা থেকে উৎরাইয়ে কতকটা নেমে এমন একটা জায়গায় এসে পড়া গেল যেখানে পথ বোলে কিছু নেই,—একেবারে খাড়া নিচে গভীর খাদের বুকে যমুনা গর্জ্জন করতে করতে চলেছে দেখা গেল। মন্দিরও দেখা গেল সেখান থেকে অবশ্য অনেকটাই দূরে নিচে। প্রকাণ্ড পাথর, কেবল ধুসর বর্ণের পাথরের কাঁড়ি আর তার মাঝে মাঝে ছোট-বড় নানা প্রকার তরুলতা। এই যে ব্যবধান, অর্থাৎ ওপর থেকে নদী গর্ভ পর্য্যন্ত প্রায় আশী হাত জায়গা নামাও যেমন কষ্টকর আবার এতটা নেমে এসে মন্দির ও ধর্ম্মশালার অদর্শনও তেমনি কষ্টকর। কারণ এতটা নিচে থেকে তা দেখার কথা নয়। এখানে ছোট-বড় নানা আকারের পাথরের কাঁড়ির মধ্যে যমুনা প্রায় চার পাঁচটি ধারায় প্রবাহিতা। প্রত্যেকটারই ভয়ঙ্কর বেগ আর শব্দ মিলিয়ে স্তম্ভিত করে দেয়। বাহকের সাহায্যে পথ করে নেওয়া গেল, তারপর এই নদীগর্ভ থেকে কতক চড়াই উঠে তবে ধর্ম্মশালা পাওয়া গেল।

যমুনার ধারাগুলির ওপর দিয়ে পার হয়ে খানিকটা ওপরে উঠে যে যমুনা মন্দির দেখা যায় তার পিছনে চিরতুষারমণ্ডিত নগ্ন পর্ব্বতস্তর। মন্দিরটি পাথর ও কাঠ মিলিয়েই তৈরী। শুনেছিলাম কতকটা গঙ্গোত্তরীর পুরানো মন্দিরের মতোই। এই যমুনার ধারা প্রত্যেকটি পাঁচ ছ' হাত চওড়া,—দেখলেই মনে হয়না যে, এটা উৎস। উৎস দেখতে হলে আরও অনেকটা উত্তর মুখে তুষার-রাজ্য মাড়িয়ে যেতে হবে। সে কথাটা পরে বলচি। এতটা উচু হিমালয়ের প্রায় তুষার রাজ্যে কাছাকাছি মন্দির গড়া বা পাথরের পাকা বাড়ি তৈরী বড় সহজ বিষয় নয়। কিন্তু যেখানে কাজের সঙ্গে ধর্ম্মের টান সেখানে এই আমাদের হিন্দু জাতিটি অসাধ্য সাধন করতে সক্ষম হয়ে থাকে। মূলে ধর্ম্ম প্রেরনাই কাজ করে হিন্দু জাতির সকল উদ্দেশ্যের মূলে। এখানেও দেখেছি আর গঙ্গোত্তরীতেও দেখেছি প্রায় একই ছাঁদের মন্দির, তার পরিবেষ্টনীও একই প্রকার, তবে এখানকার বৈশিষ্ট্য এই যে এখানে মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে স্রোতটি অনেক নীচে। সিঁড়ি নেই ধাপ আছে, কোনটা এক ফুট কোনটা দেড় ফুট কোনটা বা দু ফুট। দেব মন্দিরের মধ্যে এমনই একটা অন্ধকার আর আলোর মেশামিশি বাইরে থেকে

ঢুকলে অন্ধকারই মনে হয়। আবার নীচে স্রোতের ধারে জলের কাছে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ থাকলে দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে আসে জলের গতি দেখতে দেখতে। তারপর

নির্জ্জনতা, এর তুলনা নাই। স্রোতের শব্দই সকল শব্দকে ঢেকে ফেলে, সে শব্দ আমাদের মনকে কোথায় যেন টেনে নিয়ে যেতে চায়; আমরা কিন্তু সেখায় যেতে

চাইনা। কেউ কেউ যেন ক্ষণেকের জন্য সমাহিত হলেন, তারপরই বাহ্য জগতে এসে শত মুখে বর্ণনা আরম্ভ করে দেবেন, আহা, উহু, জলের কি অপূর্ব্ব গতি দেখলাম, কি ভয়ানক গর্জ্জনই শুনলাম, জীবন ধন্য হয়ে গেল ইত্যাদি। চক্ষু আর কান, যা দেখে আর শোনে এখানে এসে তার ভিতর দিয়েই যাত্রার স্বার্থকতা প্রতিপন্ন করে নিশ্চিন্ত। ধীমান যাঁরা তাঁরা আরও কিছু পান যা কোন প্রকার বর্ণনার অপেক্ষা রাখেনা। সেটা কি? বলবার কথা মোটেই নয়, আবার সকলকার কথাও নয়, ধীমান যাঁরা তাঁদেরই কথা এবং অনুভূতিরই কথা। বাকী যাঁরা এ সব তীর্থে আসেন ঐ চক্ষু ও কর্ণের তৃপ্তি সাধন করে সাক্ষী সরূপ অনেকগুলি ফটো সংগ্রহ করে অধীর আগ্রহে স্বদেশ স্বজন বান্ধবগণের সামনে ধরে যাত্রার সাফল্য প্রমান করে কৃতার্থ হয়ে যান। মোট কথা এই দুর্গম তীর্থে একেতো খুব কম লোকই আসে, তার মধ্যেও আবার স্থান বা দৃশ্যের মানুষই বেশী, কচিৎ দুই একজনই মহামনা,—এক্ষেত্রে, দেখা ও শুনার উপরের কিছু অনুভব করেন সেকথা সহজে প্রকাশের চেষ্টা বিড়ম্বনা মনে হয়।

এখন সাধারণ যমুনোত্তরীর কথা বলে নিতে চাই। কালী কমলিওয়ালার ধর্ম্মশালাই আমাদের মতো যাত্রীর একমাত্র আশ্রয়। আমাদের মতো শুধু নয়, ধনবান যারা তাঁবু সঙ্গে করে আনেন তাঁদের কথা অবশ্য আলাদা, যাদের তাঁবু নেই তাঁদের এই ধর্ম্মশালা ভিন্ন উপায়ও নেই। এদিকে বেশি যাত্রী আসেনা যেমন কেদার-বদরির পথে বহু যাত্রীই যাতায়াত করে প্রত্যেক বৎসরেই। এখানে তাই দোকান বাজার নেই, পাণ্ডাদের বাড়ি-ঘর কিছুই নেই, খরশালিই তাদের বাসস্থান, সেখান থেকে পালা ক্রমে পাণ্ডারা এসে পূজা অর্চ্চনা যাত্রীদের পিণ্ড-দানাদি কর্ম্মে, নিত্য এবং নৈমিত্তিক ক্রিয়া কর্ম্ম সম্পাদন করে বেলা বেলি ঘরে অর্থাৎ খরশালিতে ফিরে যায়। যাত্রীরাও যমুনোত্তরীতে থাকতে পারেনা কারণ ঐ প্রবল শীত, কেবল একজন পূজারী তিনিই মাত্র থাকেন, পরে বলছি তাঁহার কথা।

এ তীর্থের ধারাই এই খরশালিতে যা কিছু সংগ্রহ করাই নিয়ম,—কারণ খরশালিই এই খণ্ডের শেষ গ্রাম এখান থেকে মাত্র চার মাইল। তারপর উত্তর দিকে আর কোন লোকালয় নেই। যাত্রীরা ভোর-বেলা বেরিয়ে, এই চার মাইল এসে এইখানে মন্দিরাদি দর্শন করে বৈকাল তিনটে নাগাদ ফিরে এখান থেকে খরশালিতে যান এবং রন্ধন ভোজনাদি রাত্রিবাস করে থাকেন। একমাত্র পূজারী যিনি এই মন্দিরে পূজা করেন তিনি ছাড়া আর কেউ থাকেনা রাত্রে। এখানে সকল কিছুই ঐ দিনমানের তৃতীয় প্রহরের পূর্ব্বেই সম্পূর্ণ হয়ে যায়। শ্রাদ্ধাদি শেষ করে সবাই দু'টার মধ্যেই খরশালি যাত্রা করে; যমুনোত্তরীর প্রাঙ্গণ জনশূন্য হয়ে যায়, কেবল প্রবল স্রোতধারার গর্জ্জনেই এই দেবলোকের মাহাত্ম্য ধ্বনিত হতে থাকে।

আমি শ্রাদ্ধ শান্তির জন্য এখানে আসিনি। কাজেই যারা ও কাজ চুকিয়ে খরশালির পানে যাবার তারা সবাই চলে যাবার পর জনশূন্য এই তীর্থে কেবল আমার বাহক, আমি আর পূজারী ব্যতীত আর কেউ রইলো না সে দিন।

যেখানে দেবীর মন্দির সেই মন্দির থেকে অল্প উৎরাইয়ের মুখে এই তুষার রাজ্যে পাঁচ ছয়টি উষ্ণ জলধারা আছে। তার মধ্যে তিনটি খুব প্রখর। অতীব উষ্ণ জলধারা ফোয়ারার মতোই পাহাড়ের গা থেকে তোড়ে বেরিয়ে আসচে—আর কুণ্ডস্থল পূর্ণ হয়ে বাইরে এসে যমুনার শীতল ধারার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। হাতে চাপড়ে আটা, রুটির মত করে কুণ্ডের মধ্যে ছেড়ে দিলে প্রথমে ডুবে যায়,—তারপর পক্ক হয়ে উপরে ভেসে উঠে,—তখন তা খাওয়া যায়। কাপড়ে বেঁধে চাল দিলে ভাত হয়ে যায়, এ সব পরীক্ষা হয়েই গেছে তুপুর বেলা। অনেক যাত্রী এই সব নিয়েই মেতেছিল।

প্রধান, অর্থাৎ পূজারী যিনি, এখানেই থাকেন বলেচি। এই মন্দির তলে কয়েক ধাপ নিচেই একটি অপূর্ব্ব গুহায়,—চমৎকার কয়েকখণ্ড পাষান এমন ভাবে সংস্থিত যে গুহার মধ্যে শীতল বাতাস, ঝড়, জল কিছুই প্রবেশ করতেই পারে না,—আর সেই গুহার নিচেই উষ্ণ প্রস্রবণগুলি অবিরাম উচ্ছ্বসিত, বিদ্যুৎ-গতিতে প্রণালীপথে যমুনার ধারায় মিশেচে। এই তুষার-রাজ্যে পূজারীর গুহাটি অতিব সুখের আশ্রয়। প্রকৃতির কোলে এমন আশ্রয় সত্যই লোভনীয়—। আমার সঙ্গে এই গাড়োয়ালী পণ্ডিত রঘুনাথ মিশ্র—পূজারী ঠাকুরের কেমন এক মিত্রতা জন্মে গেল, বিশেষতঃ আমি যখন অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে খরশালী ফিরে গেলাম না, যমুনার উৎপত্তি-স্থান দেখব বলে রয়ে গেলাম। আমরা তুষার-ক্ষেত্রের উপর দিয়ে যমুনার মূলধারা বা উৎস যতটা সম্ভব দেখতে যাবো, একথা জেনে তিনি আমাদের সঙ্গী অথবা গাইড হয়ে নিয়ে যাবেন বোলে স্বীকার করলেন।

বৈকাল অর্থাৎ তুই থেকে তিনটার মধ্যে যাত্রীরা খরশালীর পথে চলে যাবার পরেই পাণ্ডারাও ছাঁদা বেধে নিজ নিজ প্রাপ্য বুঝে নিয়ে নিজ স্থানে চলে গেল। আমরা বিরলে বসে অনেকক্ষণ নানা কথায় মগ্ন ছিলাম। রঘুনাথজীর এমন প্রেম পূর্ণ ব্যবহার, কতো কতো পৌরাণিক কথা এই তীর্থ সম্পর্কে নানা প্রকার আশ্চর্য্য কাহিনী শুনিয়ে আমাদের স্তম্ভিত করে রেখেছিলেন। যে সকল কথা ঐ সময় হয়েছিল তার মধ্যে একটা কথা আমার সত্যই মনে লাগলো, এমন কথা পূর্ব্বে কারো কাছে শুনিনি।

তিনি বলেন যে, এই যমুনার-মন্দির অবধিই মানুষের গতি, এর পর উত্তর দিকে আর মানুষের গতাগতিই নেই। তুষার রাজ্য সারা উত্তর দিকটা জুড়ে আছে, স্থানটি মানুষের সম্পর্ক বর্জ্জিত, কারণ সেটা দেব রাজ্য। তাই মানুষ যাতায়াতের পক্ষে সকল রকম বাধা সৃষ্টি হয়েছে ঐ পথে। সে সকল বাধা এমন ভাবেই তৈরী হয়েছে যাতে মানুষ কোন প্রকারে যেতে না পারে সে দিকে।

মানুষের দেহটাই তো নরক, তার মন বুদ্ধি যতই কেন না উঁচু হোক দেহ থাকতে তার নরক থেকে নিষ্কৃতি নেই আর সেই জন্যই দেবলোকে তার গতিও নেই। তিনি আরও বললেন, আপনি তো গঙ্গোত্রী যাবেন, যদি গো মুখের পথে যেতে পারেন তো দেখতে পাবেন কতো কতো বিস্ময়কর ব্যাপার আছে ও দিকে। এই যমুনোত্তরী থেকে সোজা পূর্ব্বদিকে গঙ্গোত্তরী হয়ে বরাবর কেদার ও বদরীনাথ পর্য্যন্ত সীমানা দক্ষিণের রেখা আর উত্তরদিকে সমুদয় তুষার রাজ্য, মহান্ ঐ সদা শুভ্র উত্তর পূর্ব্ব ও পশ্চিমে বিস্তৃত স্থানটিতেই দেবরাজ্য, অতি প্রাচীন কাল থেকেই বর্ত্তমান। এই রাজ্যের মধ্যে কতো কতো অলৌকিক কাণ্ড হয় আমাদের তা জানবার সম্ভাবনা নেই। অথচ আমাদের এই ভূমির সঙ্গে ঐ ভূমির যোগাযোগ রয়েছে, ওখানকার কল্যাণময় আবহাওয়া আমাদের এই ভূমির উপর কত ভাবেই যে মঙ্গল আনে তা আমরা কিছুই জানতে পারি না সকল টুকুই ভোগ করি মাত্র। যদি ঐ দেব রাজ্যের প্রভাব না থাকতো আমাদের উপর, আমরা এ কথা আন্তরিক ভাবেই বিশ্বাস করি যে আসে পাশে যে সব বর্ব্বর দস্যু দুর্দ্ধর্ষ জাতি আছে তাতে এই অংশে আমাদের শান্তিতে বসবাস করাই অসম্ভব হোতো। আমার গুরু, আমার পিতা তাঁদের কাছেই আমি শুনেছি, সিদ্ধ যোগী যারা যাঁদের শুদ্ধ দেহ, এমন ভাবেই তাঁদের শরীর বাঁধা যে তাঁদের শরীরে মল মূত্রাদির কোন নারকীয় ক্রিয়াই থাকে না, তাঁরাই যেতে পারেন ঐ দেব ভূমিতে। আর তাঁদেরই কৃপায় আমরা তাঁদের ক্রিয়া কর্ম্ম রীতিনীতি কিছু কিছু জানতে পারি। আশীর্ব্বাদ নিয়ে আসেন তাঁরা আমাদের মধ্যে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম,—এমন সিদ্ধ যোগী আপনি নিজে দেখেছেন? উত্তরে তিনি বোললেন স্বধু আমি কেন আপনিও ত দেখেছেন। দেখলে হবে কি আপনি চিনবেন কেমন করে? তাঁরা যখন মানুষের সঙ্গে বা সামনে আসেন, থাকেন তখন কোন ভেদ থাকেনা সাধারণ মানুষের সঙ্গে। কোন পার্থক্য থাকেনা সাধারণের সঙ্গে তাঁদের কাপড়ে পোষাকে বা দেহে,—তাঁদের জ্যোতির্ম্ময় বিভূতি যুক্তি মূর্ত্তি তখন সম্পূর্ণ ভাবেই সম্বরণ করেন, যাতে মানুষ-মনে কোন সন্দেহ স্পর্শ করতে না পারে তাঁদের অসাধারণ মানুষ বোলে। ঐ খানেই তো তাঁদের বৈশিষ্ট্য। রঘুনাথজী বোললেন, আপনি পথে কিম্বা কোন আশ্রয়ে হয়তো তাদের নিশ্চয়ই দেখেছেন,—বাধা দিয়ে আমি হঠাৎ বোলে ফেললাম,—ঠিকই বলেছেন। কারণ ঠিক তখনই ছ্যাৎ করে উঠলো আমার মনটা সেই পূর্ণিমা রাত্রের কথা, ধরাসুতে সেই কৌলপন্থি সাধুর দর্শন না পেয়ে ফিরে আসবার সময় পথে সেই দয়ামাখানো মুখ, তারপর মানুষটির অন্তর্ধ্যান। সব কিছুই পরপর ছবির মত মনে পড়লো তিনি নিশ্চয়ই দেব রাজ্যের মানুষ। তাহলে তাঁদের সঙ্গে দেখা আমাদের হয়তো বটেই,—কিন্তু চেনার ব্যাপারে যা গোলমাল,—আমাদের পক্ষে তাঁদের

ধরার সম্ভাবনা কোথা? তাঁরা নিজেরা ধরা বা চেনার সুযোগ না দিলে কারো সাধ্য নাই যে তাঁদের চিনে বুঝে ব্যবহার করতে পারে। সত্য, একথা ধ্রুব সত্য।

মিশ্রজীর কথায় আমি এতটা মুগ্ধ হলাম যে কোনপ্রকার সঙ্কোচ আর আমার রইলো না, আমি বোলেই ফেললাম;—মিশ্রজী আপনি নিশ্চয়ই চিনতে পারেন,—আমার তাই বিশ্বাস, নাহলে ঐ সত্য কথা এমন সহজ ভাবেই বোলতে পারতেন না। তিনি একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন আমার চাপল্য দেখে এবং আমার কথাগুলি শুনে। কিন্তু তখনই কিছু আর বেশী কথা বোললেন না,—স্বধু এইটুকু বললেন,—আচ্ছা এখন থাক এসকল কথা, আমার পূজারতির সময় হোলো, আপনি তো রইলেন পরে আবার এ প্রসঙ্গে কথা হবে। তিনি নিজ কর্ম্মে চলে গেলেন। ও সকল কাজ সন্ধ্যার পূর্ব্বেই হয়ে যায়।

আমি ততক্ষণ একটু বাইরে,—যমুনা মন্দির থেকে কতকটা তফাতে একটু ঘুরে ফিরে বেড়িয়ে নিলাম। এ সুযোগ তো আমার অদৃষ্টে আর আসবেনা। যতক্ষণ পাওয়া গেছে, শরীর পটু আছে, বেশী ওঠানামার মধ্যে না গিয়ে সহজ স্থানেই একটু ঘুরে ফিরে দেখছি। জনার্দ্দনও আমার সঙ্গে ছিল। এই যমুনোত্তরী মন্দির সংলগ্ন যে স্থান এই ক্ষেত্রে এলে মনে হয়না যে এইখানেই লোকালয়ের শেষ। অবশ্য লোকালয় এটা নয়,—বিজন এই পার্ব্বত্য প্রদেশে চারিদিকেই পর্ব্বত, বিশেষতঃ দুই পাশে তো বেশ দেওদারাদি বৃক্ষ সমাকুল উপবনের মত বিরাম স্থান, কিন্তু এখানে দাঁড়ালে এই কথাই মনে হয় এর পর উত্তরে আরও অনেক—লোকালয় আছে। মন্দির থেকে প্রায় আধ মাইল উত্তর-পূর্ব্ব কোণের দিকে আসবার পর তবে বরফের মূর্ত্তি দেখা যায়। সে অনেকটাই তুষার ক্ষেত্র। সামনেই দেখা যায় বিশাল যমুনোত্তরী গ্লেশিয়ার, গঙ্গোত্তরীর তুলনায় ছোট নয় পরন্তু শেষদিকে তুষার মণ্ডিত পর্ব্বতও আছে। অবশ্য যতক্ষণ না এই ফাঁকায় আসা যায় যমুনার মন্দির সংলগ্ন স্থানটি পেরিয়ে, ততক্ষণ মনে হয়না যে উত্তর খণ্ডের এ অংশের লোকালয়ের শেষ। এইভাবে,—আমি বন্ধু জনার্দ্দনের সাথে আজ, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বেশ খানিকটা দেখে নিলাম। যাই কিছু দেখি, কানে যমুনার কল্লোল সকল সময়েই আমায় জাগ্রত রেখেছিল—এক্ষেত্রের শব্দময় রূপ-মাহাত্ম্যে। উপরের আকাশে আজ আর এক বিশেষত্ব সারাদিন মেঘে ভরা সূর্য্যের মুখ দেখতে পাইনি, বৃষ্টিও ছিলনা, কেমন অন্ধকার অন্ধকার ভাবটা সারাদিন থেকেই দেখতে দেখতে যেন একটা রহস্যময় বায়ুমণ্ডলের মাঝে আমরা তিনটি প্রাণী রয়েছি,—এখানে যেন অন্য লোক, এলোকে চেতন জীব বলতে পর্ব্বতবক্ষে দেওদারাদি কয়েকটি মহীরুহ আর কৃষ্টবর্ণ মেঘাবৃত আকাশ আর শব্দময়ী দুর্দ্দান্ত বেগবতী নীলাভ যমুনার ধারাগুলি ছাড়া আর কোন জীবিত সত্তাই নেই।

রঘুনাথজী শর্ম্মা যখন নিজ কর্ম্মে চলে যান তখন মনে হোলো অনেকটাই বেলা আছে, তাই জনার্দ্দনের সঙ্গে খানিক ঘুরে, যখন ক্লান্ত হয়ে একটা পাথরের উপর বসেছি নীচেই ঝড়ের বেগে যমুনা ধারা,—জনার্দ্দন বাবাজী বোললেন, আউর আধা ঘণ্টেকা অন্দর আঁধিয়ার হো যায়েগা। চলিয়ে, ফির মন্দির পৌঁছানে ভি টাইম লাগেগা। কাজেই আর বসা হলনা, উঠলাম, এবং চলতে লাগলাম। সত্য কথ', অল্পক্ষণেই একেবারে হঠাৎ অন্ধকার হয়ে গেল বোধ হয় পনেরো মিনিটের মধ্যে।

যমুনোত্তরী, সমুদ্রতল থেকে ১০৮০০ ফিট উপরে। মন্দিরটি ঠিক ঐ ১০৮০০ ফিটের উপর অবস্থিত,—শীত বা ঠাণ্ডার কথায় কাজ নেই। ভাদ্র, আশ্বিন মাসে আমাদের বাঙ্গলা পল্লিগ্রামের পৌষ মাঘ মাসের শীত। অথচ চারিদিকেই মেঘাড়ম্বর সব সময়েই মনে হয় যেন জল এই এলো বোলে। আমরা যখন ফিরে গুহামধ্যে এলাম তখন বাজরী অর্থাৎ গুড়া বরফ পড়তে আরম্ভ করেছে ;—গুহার মধ্যে আগুন ছিল, আমাদের কোন কষ্টই হয়নি।

কাজ সেরে রঘুনাথজী যখন এসে বসলেন, আমরা আনন্দেই তাঁর নিকটস্থ হয়ে বেশ ঘনিষ্ট ভাবেই যেন তটস্থ ছিলাম। বললাম, অব মাহাত্মা লোকন কো বাৎ শুননে বাস্তে তৈয়ার হৈ। তিনি বললেন,—এক সমস্যা কি অন্দর হাম ফাস্ গয়েথে, এই বখৎ বোই বাত মুঝে বোলনা চাতা হুঁ। শুনিবামাত্রই আমরা তখনই বললাম, বোলিয়ে মহারাজ, অবহি স্থরু করদেনা।

গেয়া সাল, ভাদো পৌর্ণমাসীমে রাজস্থানকী কোই মহারাজা ইয়ে তীরথমে আয়া থা, বহোৎ আদমী, ছোলদারী আনাজ, করীব একশো আপনা আদমী উনকো সাথ আয়াথা। দুজন রাণী ভি ৰোর, উনহিকো দোতিন সহচরীভি সাথ মে আইথি। আঠ দশঠো ছোলদারী গিরা নীল ধারে কি উপরমে।

রঘুনাথজি ভারি মিষ্টি করে বলতে লাগলেন ;—পহলা রোজ বো তীরথকা কাম সব হো চুকা, খানে পিনে কুছ দের ভই,—সন্ধা হোতে আগে সব কোই ছোলদারীমে ঘুসা, বাহার মে কোই রহা নই। মহারাজ তো জোয়ান মরদ্ থা ;—ঔর ওবখৎ হাতমে হাথিয়ার রাখতে। চার পাঁচ সিপাহি ভি সাথ-হি-সাথ রহতেথে যবহি মহারাজ -নে ছোলদারীসে বহার আতেথে। পহলা রোজ, পিণ্ড শ্রাদ্ধ হোচুকা পিছে, তীরথকো পাণ্ডালোক, বহোৎ খরশালিসে আয়াথা, বহোত ভোজন মিলা। পিছে মহারাজ নে ইয়ে শোচা যে গরীব আদমী কঁহা মিলি,—ভোজন পিছে কম্বল দান করনেকো বাস্তে বহোত কম্বল ভি সাথ লায়া, ক্যা হোগা ও সব্ যদি এ ওয়াখৎ গরীব আদমী কোই ইহাঁ না মিলি।

বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার। মহারাজ গরীবদের কম্বল দান করবেন, খাওয়াবেন, পাণ্ডারা তো মহা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো। শেষে পাণ্ডারা পরামর্শ দিলে এক দুজন রাজার তরফের

কর্ম্মচারী লোক তারা, আগে আগে যেসব গ্রামে আছে খরশালী থেকে যেমন হনুমান চটি, রাণা চটি, দাদোতি, উজরী পর্য্যন্ত সকল গ্রামের দরিদ্র প্রজাদের খবর দিয়ে আসুখ তারা যেন তৃতীয় দিনের প্রাতে এক প্রহরের সময় যমুনোত্তরী মন্দিরে উপস্থিত হয়—তারপর ভোজন পর্ব্ব দ্বিপ্রহরের মধ্যে সমাধা করে রাজার দান গ্রহণ করে। ঠিক সময়ে তারা খরশালীতে চলে যাবে।

এই ব্যবস্থাই ঠিক হয়ে গেল।

রঘুনাথজিও এই ব্যবস্থার মধ্যে ছিলেন, মহারাজ তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। এখন যেসব নিমন্ত্রিতেরা এলো তাদের মধ্যে একজন ছিল পাগলা গোছের মানুষ,—সে নিঃসঙ্কোচে সবার সামনে নেচে নেচে গান করতো। একখানা কবিরের গান তার বড় ভালো লেগেছিল তাই সে মহানন্দে তাল দিয়ে গাইতে আরম্ভ করে দিলে।

রাজার সাঙ্গোপাঙ্গ বার বার তাকে সাবধান করে দিলে যে, অতবড় একজন মহারাজার সামনে গান করা ধৃষ্টতা। কে শোনে তাদের কথা, মহা আনন্দে প্রথম থেকে রাজার ক্যাম্পের চারধারে ঘুরে ঘুরে সে গান করে বেড়ালে। ভোজনের সময় সকলের সঙ্গে সে খেতে বোসলেইনা;—সবার খাওয়া শেষ হলে রাজা তাকে জিজ্ঞাসা করলে, তুম কুছ খায়াভি নাই, লিয়াভি নাই,—ই ক্যা বাত্। তখন সে বোললে, তুম ক্যা খিলায়গা মুঝকো? রাজার আত্মাভিমানে বেশ আঘাৎ লাগলো। তিনি রাগে ফুলতে লাগলেন। শেষে যখন কম্বল বিতরণ কর্ম্ম শেষ হয়ে গেল তখন সবাই দেখলে সে ব্যক্তি কোন কম্বলই পায়নি বা নিলেনা। রাজা তখন বললেন, মরুক ঐ গাঁওয়ারটা শীতে, কেউ যেন ওকে কোন কম্বল না দেয়। তার পরণে এক কৌপীন আর গায়ে ময়লা, কুটিকুটি ছেঁড়া একখানা তুলোর কাপড়। গান করতে সে যখন রাণীদের তাঁবুর

ধারে এলো। এক রাণীর দয়া হোলো তিনি বললেন, তুমহারা কম্বল মিলা নহি ? সে বললে, রাণীজী, তুম মুঝকো ক্যা কম্বল দেওগে, ইয়ে ঠাণ্ডেমে আপনা বাস্তে একঠো রাখদো কামমে আবেগা।

মহারাজা সাহেব এবার ক্রোধে জ্ঞান হারালেন ;—বন্দুকটা তুলে নিয়ে তিনি লক্ষ করলেন এমন সময় রঘুনাথ এসে মহারাজের হাত ধরলেন। মহারাজ ঝটকান দিয়ে ছাড়িয়ে নিলেন নিজ হাতিয়ার, বললেন, আমায় অপমান করলে আমি গ্রাহ্য করিনা কিন্তু মহারাণীকে অপমান করেছে, সুতরাং শির লেগা, জরুর লেগা। হলো এই, যে, পাগল গান করতে করতে নেচে চলতে লাগলো উত্তর দিকে, হন হন করে সেই তুষার ভূমির দিকে আর আমাদের মহারাজও বন্দুক বাগিয়ে তারদিকেই লক্ষ্য করতে করতে এগিয়ে চললেন। শেষে দেখা গেল সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে পাগল বরফের উপর দিয়ে নাচতে নাচতে গাইতে গাইতে চলতে লাগলো, কিন্তু মহারাজ কিছুতেই তাকে আর হাতের মধ্যে পেলেন না। শেষে মহারাজ আর তাকে দেখতে পেলেন না।

মহারাজ ফিরে এসে,—রঘুনাথজীকে জিজ্ঞাসা করলেন এ সব ব্যাপার কি ?

রঘুনাথজী মহারাজকে বুঝিয়ে দিলেন ঐ পাগল দেবরাজ্যের লোক—মহারাজের প্রতি কৃপা করে দেখা দিলেন। তাতে মহারাজের কল্যাণই হবে।

সামনেই তুষার-ক্ষেত্র। যমুনার ধারা সেই তুষার-ক্ষেত্রের তলা থেকেই হুহু শব্দে বেরিয়ে আসচে আমাদের সামনেই।—মনে হয় ঐ ধারা ঐ তুষার-ক্ষেত্রের তলায় তলায় বর্ত্তমান। উপরে পাথর আর তার ওপরে বরফে ঢাকা অবস্থায় যমুনার ধারা বহুকাল থেকে এই ভাবেই প্রবাহিত। আমরা ঐ ক্রমোচ্চ তুষার-ক্ষেত্রের ওপর উঠতে আরম্ভ করলাম। চারিদিকে রৌদ্রে ঝলমল করচে, আমাদের ডাইনে-বাঁয়ে আর সামনে তিন দিকেই উচ্চ পর্ব্বত শ্রেণীবেষ্টিত বিশাল একটি ঢালু তুষার-প্রাঙ্গণ, সেই প্রাঙ্গণের ওপর দিয়ে উত্তর মুখে আমরা চলতে আরম্ভ করলাম। এ যাত্রায় আমরা ছিলাম মাত্র তিনজন।

মিশ্রজী গাড়োয়ালী ব্রাহ্মণ,—সুন্দর দেখতে, কথাও তাঁর ভারী মিষ্ট। তিনি বোললেন,—এ পথে প্রায় আরও সোজা মাইল খানেক গেলে আমরা তিনটি ঝরনা ধারা দেখতে পাবো। ঐ সামনের পাহাড় থেকেই ও তিনটি নেমে আসচে। কতক্ষণ চলতে চলতে সামনেই দেখা গেল সেই ধারা। আমরা আরও একটু দ্রুত চলতে চেষ্টা করলাম, কাছে যাবো বলে। কিন্তু পা যেন আর চলতেই চাঁয় না। হাঁফ লাগছিল,—বুকের মধ্যে যেন দম রাখা যাচ্ছিল না, কিন্তু দুর্ব্বলতা প্রকাশ না করে আমরা তিনজনে চলতে চলতে কতক্ষণ পর ঐ ত্রিধারার সামনা-সামনি এসে দাঁড়ালাম। পূজারী বললেন, গঙ্গা, যমুনা, আর সরস্বতী ঐ তিন ধারায় পৃথিবীতে

নেমেচেন। আসলে ঐ তিনটি ধারা নিচে পড়ে একটি স্রোত উৎপন্ন হচ্চে,—পরে সেই স্রোত লোকচক্ষুর অগোচরে ঐ বিরাট তুষার-প্রাঙ্গণের তল দিয়ে প্রবাহিত হয়ে যমুনোত্তরীতে এসে কয়েকটি প্রবল-ধারায় বিভক্ত হয়ে যমুনামায়ীর মন্দির তল দিয়ে নেমে চলে গেছে দক্ষিণ হিমালয়ের দিকে।

একটি মায়াময় ক্ষীণ কুজ্ঝটিকায় চারিদিক আচ্ছন্ন। তার মধ্যে আকাশ যখন মেঘ শূন্য হয়ে পড়ছিল তখন সেই তাপের বেশ একটু সুখকর স্পর্শ অনুভব করে

ওরই মধ্যে কতক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিলাম আমরা। আবার যখন পাতলা মেঘে ঢাকা দিলে সূর্য্যকে তখন চারিদিকেই এক কুহেলিকার সৃষ্টি হয়ে গেল; তারই মাঝে আমরা নড়াচড়া করতে লাগলাম। পূজারী বললেন, যদি আরও দেখতে চান তা হলে ঐ উঁচু পাহাড়ে উঠতে হবে। আর এখানে অর্থাৎ যমুনোত্তরীতে আজ রাত্রিবাস করতেই হবে। অবশ্য আমার গুহাতেই স্থান হবে। আর ভোজনের ব্যবস্থা আমিই করতে পারবো,—আজ আমার অনেক খাদ্যই আছে। শুনে আমরা আর দ্বিধা না করে বাঁ দিকে ফিরলাম। একটু কৌতূহলের উত্তেজনা ছিল, একটি অপূর্ব্ব কিছু দেখবার আশা যা সাধারণ যাত্রীরা কেউ দেখতে পায় না। একটা নেশায় যেন মশ্‌গুল হয়ে আমরা চলতে লাগলাম,—কিন্তু দ্রুত নয় ধীরে;—কারণ এপথের সবটাই চড়াই। পথের কষ্ট বা আমার শারীরিক অবস্থার কথা বার বার বলে স্থান নষ্ট করবো না। কেবল এইটুকু বললেই হবে যে প্রায় দুঘণ্টা হেঁটে আমরা পর্ব্বতশীর্ষে পৌঁছে গেলাম। সেখান থেকে যা দেখা গেল তাই দেখেই আমরা ফিরে এলাম। সেখানে এক বিরাট স্বপ্ন-রাজ্য। তাকে স্বর্গরাজ্যও বলা যায় এবং এখানকার সবারই তাই ধারণা।

যা দেখা গেল তা ভাষায় প্রকাশ বা বর্ণনা করতে যাওয়াই বিড়ম্বনা।

এক মনোরম স্বর্গরাজ্য;—নীলাভধূসর ক্ষীণ কুহেলিকাচ্ছন্ন একটি স্তর, তার মধ্যে দিয়ে বহুদূরে,—কতদূর তা অনুমান করতে পারিনি, দেখা যাচ্ছে এক স্তর তুষারমণ্ডিত পর্ব্বতমালা। পূজারী বললেন—এই পর্ব্বতমালার সামনেই যে ক্ষীণ তুষার মণ্ডিত স্তুপের মতই দেখা যাচ্ছে, মাঝে মাঝে তুষার, উত্তর ভাগে,—ঐটি **বান্দরপুচ্ছ পর্ব্বতের** শেষাংশ ঠিক তার পারেই ঐ যে এক বিশাল, অতীব প্রাচীন নীল সরোবর;—তাকে চম্পা সর বলে। ওটা দেবলোক বলেই আমরা জানি, ঐ দেব-লোকের চারিদিকে সবটাই চিরতুষারে আবৃত। এই সরোবর থেকেই যমুনা বেরিয়েছে। বিশালায়ত এবং চিরতুষারমণ্ডিত এই যে বান্দরপুচ্ছ শ্রেণী তা পূর্ব্ব পশ্চিমে-বিস্তৃত। তারই কোলে কোলে অপর এক স্তর। সেই স্তরবেষ্টিত চম্পা সরোবর, আমাদের সামনেই বহু দূরে হলেও আমরা আভাসেই অনেকটা দেখতে পাচ্ছি, মধ্যে যেন কতকটা নিম্ন ভূমি, সমতল ক্ষেত্রে, গাঢ় নীলাভ তুষার বর্ণের প্রলেপ, তার মধ্যেই ধারা ক্ষীণ-রজত শুভ্র একটি সূক্ষ্ম রেখার মতোই সেই ক্ষেত্র দিয়ে তীর্য্যকগতিতে এই পর্ব্বত-শীর্ষে এসে পড়েছে যে স্তরে আমরা দাঁড়িয়ে ছিলাম। নীচে থেকে যে ত্রিধারা দেখেছিলাম মনে হল তার মাঝের ধারাটিই যমুনা। অপর দুটিধারাও হয়তো ঐ হ্রদের কোথাও থেকে হয়তো বেরিয়েছে। স্থানে গিয়ে না দেখলে জানা যাবে না। এতদূর থেকে অনুমান সম্ভব নয়। ঐ স্থান যে দেব-স্থান সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, আমার মনে গোপনে একটি সঙ্কল্প তখনই ঠিক এই ভাষা নিয়ে ফুটে উঠলো যে, ভবিষ্যতে নিঃসঙ্গ হয়ে একবার ঐ দিকে যাব, আর ঐ

রাজ্যের যাকিছু দেখে জীবন সার্থক করবো। পথতো দেখাই রইলো। তখন আর কোন মুরুব্বির সহায়তার দরকার হবে না।

তখন তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হয়ে চতুর্থ প্রহরের অর্দ্ধেক উত্তীর্ণ প্রায়। সূর্যদেব দ্রুতগতি চলেছেন পশ্চিমদিকে, নেমে যাচ্ছেন দ্রুতই, বেশ বুঝা যাচ্ছে। ভাদ্রমাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ। বেলা পাঁচটা হবে। এখন না ফিরলে অন্ধকারের আগেই যমুনোত্তরী মন্দিরে পৌছনো সম্ভব নয়। যদিও সবটাই উৎরাই তবুও পথটা আমরা তো কম আসিনি, অনুমান চার মাইলের বেশি হবে, কম নয়। পথটা অনেকটাই গিরিসঙ্কটের মতো। কেবল তফাৎ এই যে এটা একটা বিশাল ঘন শুভ্র তুষার-ভূমির মাঝ দিয়ে। স্থানে স্থানে এমনই দৃশ্য এই পর্ব্বতমালার অংশবিশেষে দেখা গেল, যেখান থেকে তুষার স্তর কমেনা বা গলেনা, সারা বছর একই ভাবে রয়েচে। শুভ্র নীলাভ কঠিন স্তর,—স্ফটিক নির্ম্মিত যেন একটি বৌদ্ধস্তূপ।—আসতে আসতে অনেক কিছুই দেখলাম। সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে এই তুষাররাজ্যে কি অপরূপ বর্ণাভাষ দেখা যায় তার বর্ণনা ভাষায় অসম্ভব। বিশেষতঃ সূর্য্যাস্তের পর যখন গোধূলী এলো,—ভায়োলেট পটভূমিতে ভেসে উঠলো শুভ্র তুষারমণ্ডিত শৃঙ্গটি তাতে যেন সকল কিছু রঙ। রঙগুলি প্রথমে ছিল হাল্কা তারপর বদল হতে লাগলো প্রতি ক্ষণে, শেষে সবটাই হয়ে গেল একটা বেগুনি—পশ্চাতে গাঢ় নীল। শেষে সব যেন একাকার হয়ে গেল।

এই আমার যমুনোত্তরী দর্শনের কথা।

এক

খরশালী—শিমালী—সিংগোটা—উত্তর কাশী—৪৩ মাইল

যমুনোত্তরী হইতে ফিরিয়া সিমালীতে এসে গেলাম। এই পঁচিশ মাইল—পথের কথায় আর কাজ নাই কারণ আগে যেগুলি চড়াই ছিল ফিরিবার পথে তা উৎরাই হইয়া গিয়াছে। আর উৎরাইগুলি সবটা চড়াই হইয়া বিপরীত ভাবেই শ্রম আদায় করিয়াছে। এখন শিমালী ছাড়াইয়া চারিদিকেই চক্ষুজুড়ানো দৃশ্য, প্রথমটা পথও সোজা কতকটা প্রায় আড়াই মাইল হইবে। ইহার মধ্যে দেড় মাইলের পর একখানি সুন্দর ছোট গ্রামও অতিক্রম করিলাম। এইবার আমি খালি পায়েই চলিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম শিমালী হইতে। খালি পথে চলার সুখ আমি ভালই অনুভব করিতাম, সচ্ছন্দ বোধ আর তার সঙ্গে দ্রুত চলিতেও পারিতাম। এপথে উত্তরকাশী পর্য্যন্ত খালি পায়েই ছিলাম, বড়ই সুখের হাঁটা, কিছু বেশী শীতও ছিলনা আর কোন তুষার ক্ষেত্রও অতিক্রম করিতে হয় নাই কাজেই খালি পায়ে আমার কোন কষ্টই ছিল না; কেবল স্থান বিশেষে কাঁকর ও ছোট ছোট পাথরের টুকরা পথে থাকিলে কিছু কষ্ট ছিল।

সিংগোটা যাইতে প্রথমে প্রায় দেড় দুই মাইল সোজা রাস্তার শেষে বেশ ঘন বসতি একখানি গ্রামের মধ্য দিয়া যাইতে, গ্রামের অধিবাসী নর নারী, বালক বালিকা, বৃদ্ধ বৃদ্ধা, সকল প্রকার মূর্ত্তির পানে আমরাও যতটা দেখিলাম আবার তারাও দেখিল ততোধিক। আমার ছিল অপরূপ মূর্ত্তি, এ বেশ ভূষার সঙ্গেও তাহাদের পরিচয় ছিল না, কাজেই তাহারা একটু বিস্ময় বোধ করিয়াই থাকিবে। আমরা গ্রাম পার হইয়া শস্যক্ষেত্রে পড়িলাম। গৃহিণীগণ দিব্য কোমর বাঁধিয়া ক্ষেত্রে কাজ করিতেছেন;— আমরা দেখিতে দেখিতে কয়েকটা ক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া পথে পড়িলাম। এ পথের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। এক পাশে জঙ্গলে মধ্যপথ অপর দিকে ঢাল নামিয়া দূরে নদীতে গিয়া নামিয়াছে এই ভাবে এক জায়গায় আসিয়া এক ঝরণা পাইলাম। এইখানে বসিয়া

সঙ্গে আনিত কিছু খাদ্য, প্রাতঃ কালীন জলযোগ শেষ করিয়া আবার পথে চলিতে সুরু করিলাম। এবার যথার্থই একটা চড়াই আরম্ভ হইল,—বেশ জবর চড়াই। প্রায় যখন দেড় মাইল আরোহণের পর একটি পাথরের উপর বসিয়াছি আর চারিদিক দেখিতে ছিলাম, দেখি, দক্ষিণ দিকের একটা বড় পাইনের পাস দিয়া আমার সঙ্গী বাহক বাহাদুর আসিতেছেন। তিনি নীচে কোন স্থান হইতে পাকডাণ্ডির পথটা ধরিয়াছিলেন, সোজা এবং খাড়া উঠিয়া আসিয়া এখন ঘটনা ক্রমে আমার সঙ্গে মিলিলেন। তার পর পিঠের বোঝাটা একটা যুতসই পাথরের উপর রাখিয়া একটু হাঁফ ছাড়িলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম চড়াই উর কেত্তে দূর? উত্তর হইল,—

ইয়েতো অভি খতম হো-রহা,—ফির ভি দুসরে চড়াইহৈ, বো দেখো, ফাল্লা কি ধারতক্। তব পিছে উৎরাইমে সিংহোটা গাঁও মিলেগা, সাহেব। বলিয়া ঐদিকটা দেখাইয়া দিলেন যেন এইখান হইতেই দেখা যাইতেছে। অবশ্য যাত্রা কালে আমার ধারণা ছিল, এবেলাই সিংহোটায় নিশ্চয় পৌছিব। এখন সাথীর কথা শুনিয়াই উঠিলাম, চলিলাম,—দেখা যাক্ দুসরে চঢ়াই, কত্তোটাই বা আছে। প্রায় মাইল খানেক এই চড়াইটা আরও উঠিয়া এক ঝরণার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল, ছোট্ট ধারাটি। কয়েক অঞ্জলী জল পান করিয়া যখন পথের সঙ্গে মিলিলাম তখনই দেখিলাম সম্মুখেই এবার খাড়া চড়াইটি মূর্ত্তিমান দাঁড়াইয়া আছে। কেশবানন্দের উপদেশ, শনৈ পর্ব্বত লঙ্ঘনম,—প্রথমটা শনৈ থাকে তার পর রোখ চাপিয়া গেলে তখন একটু দ্রুত হয়, কিন্তু সুখের বিষয় এই ক্রমোচ্চ ভূমির এমনই পরিস্থিতি যে সত্যই তোমায় বাঁচাইবার জন্য প্রকৃতি-জননী কখনই তোমার আকাঙ্খানুসারে দ্রুত চলিতে দিবেন না,—প্রতি পদে বাধা দিবেন। ভাগ্যক্রমে শেষদিকে অর্থাৎ পর্ব্বত শীর্ষের নিকটবর্ত্তি হইলে দেখা গেল পথ এবার ততটা কঠিন নয়।

যাত্রা-পথে চিন্তাই আমার অন্তরতম সাথী, আর সম্মুখের ওই মহান্ দৃশ্যই আমায় যেন টানিয়া লইয়া যাইতেছে। আমার দুই পাশেই দেখিতেছি তবকে তবকে পুষ্প গুচ্ছ, বর্ণ বৈচিত্র্যে আমার দৃষ্টিতে একটা মধুর মাদকতা, আনন্দে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। লাল, বেগুনী, নীল, গোলাপী,—কোথাও শ্বেতবর্ণ কোথাও পীত, স্বর্ণাভ সিন্দুর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রচনা, সব মিলাইয়া একখানি যেন বিচিত্র উজ্জ্বল বর্ণে রঞ্জিত অসমতল, বহু দূর বিস্তৃত প্রকৃতি রচিত আসন একখানি আমার সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে কখনও বা আমি তাহার উপর দিয়াই চলিতেছি। কখন কখন ঐ পুষ্প গুচ্ছ প্রস্তর সমাকীর্ণ ভূমির উপর দিয়া যাইতে সত্য সত্যই পদদলিত করিয়াই চলিতেছি। এমন বিচিত্র ফুলের ক্ষেত্র এপথে পূর্ব্বে দেখিনাই—ঠিক এই ভাবের কতকটা স্থান উত্তর কাশী হইতে দুইটি পাড়াও পার হইয়াই দেখিয়াছিলাম। সেকথা এখানে নয়।

যাহা হউক শেষ দিকে ফাল্লায় পৌছাইয়া এক প্রৌঢ় বয়স্ক কৃষককে, এক ভাণ্ড ঘৃতই হইবে, হাতে ঝুলাইয়া আসিতেছে সম্মুখেই দেখিলাম। তাহাকে জিজ্ঞাসায় জানিলাম, সিংহোটা যাইতে, অব তো রাহতা অচ্ছা হৈ ঘণ্টে দুঘণ্টে মে পৌছ যাওগে। সাড়ে তিন মাইল পথ, এ স্থান হইতে—আর বিশ্রাম না করিয়াই পাড়ি লাগাইলাম। আমায় দ্রুত চলিতে দিল না,—কারণ সারা পথটা উৎরাই, সংযত ভাবেই চলিতে হইয়াছিল। কিন্তু কি সুন্দর দৃশ্য এই পথে, দেওদার কুঞ্জ এবং পার্ব্বত্য নির্ঝরিনী দেখিতে দেখিতে চলিলাম। এতটা চড়াই উঠার শ্রম অবশ্য উৎরাই মুখে অনুভবই হইল না। স্থানে স্থানে পাইন উপরে নীচে, বামে দক্ষিণে সকল দিকেই গন্ধে বায়ুমণ্ডল আমোদিত। দিব্য গন্ধ ও দিব্য দৃশ্যের মধ্যে দিয়া উঠিতেছি নামিতেছি, আবার কোথাও অল্প বিরামের পরেই আবার উঠিবার কালে পিছনে দেখিতেছি আমার সাথীর কোনরূপ নির্দ্দেশ মিলিতেছে না। এই ভাবে শেষ সাড়ে তিনটি মাইল অতিক্রম করিয়া উৎরাইয়ের পথেই গ্রামখানি পাইলাম। পথ হইতে কিছু উপরের দিকে সিংহোটা গ্রাম,—পনেরো বিশ ঘর বসতি লইয়া গ্রামখানি প্রশান্ত গাম্ভির্য্যে এ অঞ্চলের একমাত্র আশ্রয় হইয়া আছে। যাহা হউক এখন স্নানান্তে ভোজনের ব্যবস্থাই আসল।

এখানে মুদি বানিয়া বাবাজীর দোকানেই সওদা লইয়া উৎকৃষ্ট আতপান্ন পর্য্যাপ্ত গব্য ঘৃত সংযোগে মসুরকি দাল, আচার ও শেষে দহি মিলিল। অতীব ক্লান্ত ছিলাম সুতরাং বিশ্রাম ও হইল কতকক্ষণ। তার পর উঠিয়া একবার গ্রামখানি প্রদক্ষিণ করিলাম।

সিংহোটা গ্রামখানিতে কিছু দ্রষ্টব্য বিষয় নাই। প্রাকৃতিক দৃশ্যেই সমৃদ্ধ চারিদিক, আর একদিকে এখানকার স্বাস্থ্যপূর্ণ বায়ুমণ্ডল, শান্তির আগার, প্রকৃতি জননীর অতিপ্রিয় এইরম্য স্থল। এক রাত্র কাটাইয়া পর দিন প্রাতে যাত্রা নাকোরা হইয়া উত্তর কাশীর পথে।

এই পথ মাইল খানেক সোজা, চড়াই উৎরাই নাই চমৎকার পথ, আধ মাইল চলিয়া নামিতে আরম্ভ করিলাম। জঙ্গলের ধারে ধারে কখনও বা জঙ্গলের ভিতর দিয়াই পথ, তাহার মধ্যে কোথাও একটু চড়াই কোথাও বা একটু উৎরাই এই ভাবে উঠানামা করিতে করিতে নাকোরা পৌছাইয়া গেলাম। এইখান হইতেই গঙ্গা তীরে তীরে ভাল বাঁধা সড়ক চলিয়া গিয়াছে উত্তর হিমালয়ের পথে।

কখনও দক্ষিণে কখনও বামে কখনও সোজা। ছোট ছোট ঝোপ জঙ্গলের পাশ দিয়া পথ গিয়াছে, ধান ক্ষেতের ভিতর দিয়াই বেশী ভাগ পথটি। ছয় মাইলের এই পথ আমাদের বেশী ভাগ ধান জমির উপর দিয়া বলিলে ভুল হইবে না। পর্ব্বতের উপর ধান্য ক্ষেত্রের কথা আগেই বলিয়াছি, বিচিত্র দৃশ্য। তার মাঝে মাঝে আবার দুই চারিটি পাইনও আছে। মনোমুগ্ধ কর এই পথটি, সোজা, সমতল না হইলেও কঠিন

চড়াই উৎরাই মোটেই নাই। এই ভাবে আমরা নাকোরী হইতে উত্তর কাশীতে, মধ্য

হিমালয়ের অতীব সুন্দর, প্রায় সমতল ক্ষেত্রে অবস্থিত মহা মহিমান্বিত তীর্থে পৌঁছিয়া

নিশ্চিন্ত হইলাম। এখানে ধর্ম্মশালায় উঠিয়া মনে হইল যথার্থই শিবের অধিকারে আসিয়া পৌছিলাম।

উত্তর কাশীর মহিমা ভাষায় প্রকাশ করিতে গেলে নিজের অক্ষমতার পরিচয় প্রকাশ হইয়া পড়ে। মনে হয় কাজ কি অত প্রকাশ করিবার চেষ্টায়, সমাহিত হওয়াই ভালো। চারিদিকেই অভ্রভেদি বিশেষতঃ উত্তর পূর্ব্ব ও পশ্চিমে গিরিরাজ্যের সীমাহীন প্রসার দেখিতে দেখিতে একটা উন্মাদনা প্রাণের মধ্যে ক্রিয়া আরম্ভ করিয়া দেয়। যেখানে শেষটা আকাশের সঙ্গে মিলিয়া এক হইয়া গিয়াছে, সেই শেষে কি আছে দেখিবার জন্য প্রাণটা ছট ফট্ করিতে থাকে, যেন ঐ শেষ না দেখিলে আমার জীবনই বৃথা। আকাঙ্খার প্রসার আমাদের সত্যই গতিশীল,—আমি এক বিস্তীর্ণ সমতল ভূমিতে বসিয়া চারিদিকের বিশাল পার্ব্বত্য রাজ্যের সীমায় পৌছিবার কল্পনা করিতেছি,—মানুষ মনের এটা এক অদ্ভুত পরিচয়।

চারিদিকে বিশাল পর্ব্বতমালা, মধ্যে সমতল উপত্যকা বা অধিত্যকা ভূমির উপর গ্রাম বা নগর এই হিমালয় রাজ্যে অনেক গুলিই আছে, তার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ডেরাদুন। এই যে সুন্দর ডেরা, চতুর্দিকে পর্ব্বত শ্রেণী নদী, ঝরণা, মধ্যে প্রকাণ্ড সহর,—মহাপুণ্য ফলেই মানুষ এই সকল স্থানে বাস করিবার অধিকার পাইয়া থাকে। বিশেষতঃ উত্তর কাশীর মত স্থান অবশ্য ডেরাদুনের মত অত বড় নয়, কিন্তু তাহার পবিত্রতা গভীর। মধ্য হিমালয়ের এই ছোট্ট নগরটি, এমনই ইহার পরিস্থিতি একবার ইহার মধ্যে প্রবেশ করিলে আর ইহার বাহিরে যাইবার প্রবৃত্তি থাকে না। অবশ্য সংসারী মানুষের সকল কিছু সুখ ও সুবিধা এখন এখানে হইয়াছে। মানবের জীবন যাত্রা পথে যাহা চাই, ভোগ বিলাসের সকল কিছুই পাওয়া যায়। এজন্য নহে,—মানব জীবনের চরম লাভ শান্তি ও মুক্তি এইখানে তাহা করায়ত্ত মনে হয়। সেই কারণেই আর ইহার বাহিরে যাইবার প্রয়োজন বোধ হয় না, একবার এখানে আসিয়া পড়িলে। এই কথাটাই এখন বলিতে চেষ্টা করিতেছিলাম।

মানুষ সমাজ বদ্ধ জীব, এখানে সেই মানুষ-সমাজ শুদ্ধ, পবিত্র এবং উন্নত, এমনটি প্রায়ই দেখা যায় না। প্রথমতঃ অন্নই সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ, অধ্যাত্ম জীবনই সার করিয়া যদি তুমি নিতান্তই আত্ম চেতনানুগ থাকিতে পার তাহা হইলে অন্নের অভাব হইবে না, বিনা আয়াসেই তুমি অন্ন পাইবে। বাবা কালী কমলীবালার ক্ষেত্র আছে, পাঞ্জাব সিন্ধু ক্ষেত্র আছে, জয়পুর মহারাজের ক্ষেত্র আছে, আরও ছোট ছোট কয়েকটি সাধু প্রতিপালনের ব্যবস্থা আছে। তারপর সৎসঙ্গ যা আছে এমন উদার ধর্ম্ম সঙ্ঘ আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। ইদানীং রামকৃষ্ণ মিশনের চমৎকার অবস্থিতি বাঙ্গালীর গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। এতদিন এই উত্তর কাশীতে বঙ্গবাসীর কোন বিশেষ

প্রতিষ্ঠান ছিল না, অবশ্য বাঙ্গালী সাধু সজ্জন, এবং ক্ষুদ্র সঙ্ঘ দুই একটি ছিল—কিন্তু মিশনের কাজ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই এই রামকৃষ্ণ মিশনই অগ্রগণ্য হইয়া সেবার গৌরবে সর্ব্ব শ্রেণীর শ্রদ্ধার আস্পদ হইয়া উঠিয়াছে। কি সুন্দর ব্যবস্থা, যে কেহ একবার সেবাশ্রমে উপস্থিত হইবেন তিনিই বুঝিবেন সেবা ধর্ম্মের যথার্থ রূপ এই খানেই রহিয়াছে। আমি দুইবার মাত্র গিয়াছিলাম,—বাইরে বাইরেই সকল ব্যবস্থা দেখিলাম, আলাপ পরিচয় সূত্রে সময়ের অসদ্ব্যবহার না করিয়া যে টুকু ভালো সেই টুকুই করিয়াছিলাম। তিন জন স্বামি তখন সেখানে ছিলেন, মাধবানন্দজীই প্রধান, তাঁহার প্রেমপূর্ণ ব্যবহার যথার্থই মুগ্ধ করিয়াছিল।

বেশী ভাগ সময় ভাগীরথী তীরে একাদশ রুদ্রের মন্দিরে কাটাইতাম, স্থানটি আমার ভাল লাগিত। মন্দির অনেক আছে। আশ্চর্য্য কথা এই যে, এই মধ্য হিমালয়ে প্রাচীন কাল হইতেই বহু মন্দির গড়িয়া উঠিয়াছে আর তার মধ্যে এখনও কয়েকটিতে সুদূর প্রাচীনতার ছাপ রহিয়াছে, তবে বেশী ভাগ মন্দিরই আধুনিক। বিশ্বনাথ না হইলে কাশী কখনও কাশী হইতে পায় না, কাশীতে বিশ্বনাথই জাগ্রত অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ;—বারাণসীতেও যেমন হিমালয়ের উত্তর কাশীতেও সেইরূপ বিশ্বনাথ মন্দির বহু প্রাচীন কাল হইতেই আছে।

যাত্রী সমাগমের জন্য অবশ্য এখানে ধর্ম্মশালার প্রয়োজনীয়তা অনেক, তাহা ছাড়া পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম হইতে নানা শ্রেণীর লোক, এমন কি ব্যবসায়ী বণিক, যাহারা নেলাং পাস অতিক্রম করিয়া তীর্ব্বতে, তাকলাখার বা জ্ঞানমা মণ্ডি প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যাপার করিতে যায় তাহাদেরও যাতায়াত খুবই আছে। প্রধানতঃ চার শ্রেণীর মানুষ এই উত্তর কাশী ক্ষেত্রের উপর আধিপত্য করিতেছে। তাহাদের প্রধান হইল ওখানে যাঁরা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছেন—যেমন পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রীয় বিদ্যাপীঠ, রামকৃষ্ণ মিশন প্রভৃতি দ্বিতীয় ধর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠাতা কালী কমলিওয়ালা, পাঞ্জাবী প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি। তারপর যাঁহারা সেখানে স্থায়ী ভাবেই আছেন, তারপর ব্যবসায়ী ; যাহারা নানাবিধ পণ্য সম্ভার এমন কি আধুনিক ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি আমদানী করেন এবং চালান দেন, আসবাব প্রস্তুতকারী পর্য্যন্ত, ইহাদেরই প্রভাব। তাছাড়া মিঠাইওয়ালা, মুদি, মনোহারী দ্রব্য বিক্রেতা, সারা ক্ষেত্রটি জমাইয়া রাখিয়াছে, যেমন আমাদের উত্তরাখণ্ডের বারাণসী ক্ষেত্র. অত্যাধিক তীর্থকামীর যাতায়াত বাড়িয়া স্থায়ী বাসিন্দায় পরিণতি, ক্রমে ব্যবহার্য্য বস্তুর সঙ্গে শিল্প ব্যাপারে সমৃদ্ধ হইয়া এখন একটি বড় ব্যবসাকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে, এই উত্তর-কাশীর গতিও ঐ স্বাভাবিক পথেই চলিয়াছে ইহা সহজেই লক্ষ্য করা যায়। বড় বড় স্বাস্থ্য পূর্ণ ক্ষেত্রের পরিণতি এই ভাবেই ঘটিয়া থাকে। এখন তো বিমান চলাচলের কাল**ী** সেই বিমানও অনেকবার এ সকল

অঞ্চল প্রদক্ষিণ করিয়া গিয়াছে। এখানে বিমান ঘাটি নির্ম্মাণের আশু সম্ভাবনা আছে যেহেতু অবতরণের স্থানও পাওয়া গিয়াছে।

যাহা হউক এখন আমাদের বাবা বিশ্বনাথের মন্দিরের কথা বলিতেছিলাম এই উত্তরকাশীপুরস্থ বিশনাথ মন্দির বাহুল্য বর্জ্জিত, স্থাপত্যের অলঙ্কার যাহা পশ্চিম ভারতের সর্ব্বত্রই দেখা যায় ইহার মধ্যে সেরূপ কিছুই নাই। ইহার আদর্শ ও যথার্থ উত্তর ভারতীয় আদর্শ নয়, স্থাপত্যও নয়। এ ধরণের মন্দির এই হিমালয়েরই বৈশিষ্ট্য। যেমন কাশীতে অন্নপূর্ণা এখানে বিশ্বনাথ মন্দিরের নিকটে অম্বিকা দেবীর মন্দির। তাও ঐ প্রকার ক্ষুদ্র এবং স্থাপত্যালঙ্কার বর্জ্জিত সংস্করণ।

উত্তর কাশীতে তিনটি দিন ও তিনটি রাত্র ছিলাম। দ্বিতীয় দিন বৈকালে ঐ একাদশ রুদ্র মন্দির প্রাঙ্গনে এক অদ্ভুত মূর্ত্তি দেখিলাম, এমনটা এ অঞ্চলে দেখা যায় না।

গায়ের ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ, অত্যন্ত কৃশ শরীর, মাথায় আগে হয়তো চুল, ঘন জটা ছিল এখন সব উঠিয়া গিয়াছে গোটা কয়েক কালো চুল অবশিষ্ট রহিয়াছে। কপালে সিন্দুর ফোঁটা তার নীচে চন্দনের একটি ফোটা, অবশ্য শীতের রাজ্যে বাস বলিয়া কম্বলের একটি আলখাল্লার মত ঝুলিতেছে, মাথায় কানঢাকা টুপি,কানে মাকড়ি। বাবাজি চুপচাপ বসিয়াছিলেন, কারো সঙ্গে কোন কথা নেই। যেমনই আমি উঠিলাম, দেখি তিনিও উঠিলেন,—আমি যখন বাহিরে আসিলাম দেখি, তিনি ঠিক পিছনেই আছেন। যখন পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি তিনি একেবারে সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন,—ক্যা বাচ্ছা, সাধু খোঁজতে হো ? আমি কি বলিব কিছুই ভাবিয়া ঠিক করিতে না পারিয়া চুপ চাপ রহিলাম। তিনি তখন আবার বলিলেন, আরে ক্যা তুম মেরে বাৎ সমঝা নহি ?

আমি এবার বলিলাম, তীরথমে আয়া, সাধু সঙ্গ তো জরুর সোচতে, ই ক্যা বড়ি বাৎ আপনে সওয়াল কিয়া,—ইয়ে সমঝা নহি, মহারাজ। বাবাজী আমার কথায় যেন বড়ই খুসী হইলেন ;—বলিলেন, বহোৎ আচ্ছা, অব আও তো মেরে সাথ, চলো এক সাধু দর্শন করি আয়ী। চলিলাম তাহার সঙ্গে।

অনেকটা আসিয়া আমরা এক আশ্রমের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। আশ্রমটি অন্ধকার, অন্ধকার গলি, অন্ধকার ঘর, তাহার মধ্যে একটা চতুষ্কোন বেদী। আমরা এই অন্ধকার ভেদ করিয়া যখন ঘরে প্রবেশ করিলাম তখন প্রায় সন্ধ্যা কিন্তু তখনও দীপ জ্বালা হয় নাই। এরা অন্ধকারই ভালবাসে। যে ঘরে দিনমানে দীপের প্রয়োজন মনে হয় সেখানে সন্ধ্যার প্রাক্কালেও কোন আলোকের আভাব নাই।

বৈঠ যা, বলিয়া সঙ্গের সাধু সেখানে নিজে বসিলেন, আমাকেও বসিতে হইল। বেদীর উপর দেখিলাম এক বিশালকায় মূর্ত্তি, আসনে উপবিষ্ট। প্রথমে দেখিতে পাই নাই, এখন দেখিতেছি, তাঁহার অঙ্গে কোনও বস্ত্র নাই। সম্পূর্ণ উলঙ্গ মনে হইল।

বসিয়া বসিয়া দেখিতেছি, আসনস্থ মূর্ত্তি কাহাকে যেন উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, সন্ত লোকন কোওয়াস্তে কুছ ভোজন দে যা—

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এক ব্যক্তি আসিয়া বড় শাল পাতায় দুইখানি পুড়া আর কতকটা আটার হালুয়া দিয়া গেল। প্রায় ভরপেট খাওয়ার ব্যবস্থা, যতটা ছিল সবটা প্রসাদ হিসাবেই খাইতে হইল, ফেলিতে পারিলাম না। তারপর আসনস্থ পুরুষ বলিলেন,—যম্ নিয়ম মানতে হো? অন্তস্থ য এর উচ্চারণ সংস্কৃতে, ই+অ যুক্ত উচ্চারণ যেমন হয় সেইরূপ।

আমি যে উত্তর দিলাম, বোধ হয় তাহা মনঃপুত হইলনা, তখন বলিলেন, রেণ্ডিমে কেত্তা দিন ফাসা? অর্থাৎ কতদিন নারীগ্রহণ করিয়া সংসার করিতেছ? এখানে এই রেণ্ডি কথাটার একটু ব্যাখ্যা আছে। আমাদের শঙ্করাচার্য্যের দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত যাঁরা, তাঁরা ত্যাগী বলিয়াই খ্যাত। এ ত্যাগী বলিতে সংযমী সংসার ত্যাগী;—সংসার ত্যাগী বলিতে নারী বিমুখ। নারীর রূপ দেখা তো নয়ই, নারী সম্বন্ধে কোন কথা শোনা পর্য্যন্ত নিষেধ, নারী সম্ভাষণ তো বহু দূরের কথা, উহা পাতকের সামিল। তারা গৃহস্থের দ্বারে ভিক্ষার্থে গেলে এবং কোন নারী ভিক্ষা আনিলে তাহা গ্রহণ করে না; সেই জন্যই এদিকে কোনও নারীর নিজ হাতে কোন সন্ন্যাসীকে ভিক্ষা দিবার নিয়ম নাই। গৃহস্থদের যে স্ত্রী বা গৃহিণী নারী, তাহাদের প্রতি শ্লেষবচন হইল রেণ্ডি। এঁদের এই রেণ্ডি শব্দ নারী জাতি মাত্রেই প্রযোজ্য—এখানে কোন শ্রেণী ভেদ নাই। আমি যখন ইহার উত্তর দিলাম, তখন বলিতেছেন,—ঘর ছোড়কর হিমালয় পর কেঁও আয়া? কেত্তে দূর যাওগে? বলিলাম, তীরথ মে আয়া, মুঝে তো গোমুখ যানা হৈ, মহারাজ।

সিকোগে?—বলিয়া যেন কতকটা বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। আমি বলিলাম কোসিস তো জরুর করোঙ্গি। আপকো আশীর্ব্বাদ হো তো সিকেগা ভি জরুর।

তু তো বড়ি চৌহানতরে লেড়কা হৈ,—ক্যা কাম করতে ঘরমে? এখন যেন কতকটা প্রসন্ন ভাব।

তসবীর বানাতে রহা, জি মহারাজ; শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বো কৈসে? বুঝাইয়া বলিবার চেষ্টা করিলাম। পটুয়া কি কাম, বোই কহো। আচ্ছা, ধ্যানমে কোই জ্যোতি ধরতে, যব ধেয়ান লাগাতে? আমি বলিলাম, কভি কভি ঐসা কুছ হোতা থা। শুনিয়া বলিলেন, তু জপ কা কাম লে পহলে তো। পিছে যে ধ্যান আয়েগা উসিমে জ্যোতি দর্শন মিলসকতা, লেকেন তু তো রহনেবালে নহি। তখন জিজ্ঞাসা করিলাম,— কি করিলে ধ্যায়ানে স্থির জ্যোতি দর্শন সম্ভব হইতে পারে? অবশ্য খানিকটা আস্কারা পাইয়াছিলাম তাই কথাটা তুলিতে পারিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, পহলা ত্রাটকসে

স্থরু করদো ; লেকেন তুহারা মাফিক আদমীকো তো সব বে ফায়দা। কেন? জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, তু তো ইধার উধার চলতে রহোগে, এক জাগামে স্থির তো রহনেবালা নহি। কমসে কম বরষ ভর ইহাঁ রহনে সিকো তো কুছ হো সকতা।

আমার পক্ষে এখন তাহা অসম্ভব, বুঝাইয়া দিলাম। তিনি বলিলেন তব যা, তু তো উপর যানেবালা। ফির তো উতারকে আপনা রেণ্ডিকো অন্দর সব ঝাড় দেনে-বালা যো কুছ ইধার পয়দা করোগে,—যা যা উঠ যা ইহাঁসে। হঠাৎ এই বজ্রাঘাত। লজ্জায় ঘৃনায় আমি দ্রুত উঠিয়া আসিলাম।

সাধু মহাত্মার এই যে কথা গুলি উপরে তুলিয়া দিলাম, ইহার মধ্যে এক শ্রেণীর বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর গৃহীগণের প্রতি মনোভাব জানা যাইবে। সত্যই ঐ মনোভাব যাহা আমাদের দেশীয় কোন শ্রেণীর লোকের হয়তো জানা নাই। সম্প্রদায় গত সন্ন্যাসী ও বৈদান্তিক যাহারা সমাজের বাহিরে মানুষ,—তাহাদের একটা বিজাতীয় ঘৃণা আছে গৃহস্থ সাধারণের উপর। কিন্তু গৃহী না হইলেও চলেনা তাহাদের, তাই এমন স্থানেই তাঁহারা থাকেন যেখানে সংসারের ঘনিষ্ট নরনারী মিলিত কোলাহল নাই। আর তেমন সুস্থ যুবা দেখিলে তাহাদিগকে গার্হস্থ্য আবহাওয়া হইতে মুক্তির পথে আনিতে চেষ্টা করেন। আর নারী সঙ্গ ঘটিত সংসারে বিতৃষ্ণা জন্মাইবার জন্য অনেক রূঢ় কথাই বলিয়া থাকেন। শঙ্করাচার্য্যের যে নির্ঘাত উপদেশ আছে, নরক প্রবেশের দ্বার ললনা, এই কথার উপর ইহাদের বিশ্বাস মজ্জাগত। কাহাকে ত্যাগের পথে আনিতে পারুন বা না পারুন, ঐ নারী সঙ্গ ঘটিত জীবন যাপনের কথা তুলিয়া নির্লজ্জের মতই আঘাত হানিতে তাঁরা কখনও পশ্চাৎপদ হন না। যাক, এখন ঐ আঘাত হজম করিয়াই বাবার আশ্রম হইতে দ্রুত পদে আপন স্থানে আসিয়া পৌছিলাম এবং আগামী কালই এই উত্তর কাশী হইতে উপরের দিকে যাইবার সঙ্কল্প করিলাম।

এখানে বাঙ্গালী কয়েকজন আছেন, তাঁহাদের কেহবা সরকারী কর্ম্মচারী কেহবা ডাক্তার এই রূপ। আমার সঙ্গে রমেন্দ্রনাথ বসু নামক এক একসাইজ ইনস্‌পেকটার সাহেবের দেখা এবং একটু প্রীতি হইয়াছিল। ইনি কলিকাতা বাসী, জননীকে সঙ্গে আনিয়াছেন কেদার বদরী-নারায়ণ তীর্থ করাইতে। বৃদ্ধার আঁট সাট গঠন এবং অত্যন্ত কর্ম্মঠ প্রকৃতি দেখিয়া আমি চমৎকৃত হইলাম। আসলে তাঁহার নিরোগ শরীর ও সুস্থ প্রকৃতি দেখিয়া আাম তাঁহার প্রতি একটা শ্রদ্ধা পোষণ করিতাম। তিনি গঙ্গোত্তরী করিয়াছেন। পায়ে হাঁটিয়াই এতদূর আসিয়াছেন এবং কেদারনাথের পথে এইবার যাত্রা করিবেন। পুত্র তাঁহার অতীব গুণবান সর্ব্বদা ঐ মায়ের সুখ সচ্ছন্দের চিন্তায় মসগুল এবং সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছেন। হিমালয়ের নামে বুড়ির কি উৎসাহ, এমন দেখি নাই। এই যে মাতা পুত্রের তীর্থ ভ্রমণ, এবং আমার সঙ্গে পরিচয় এটা আমার সুকৃতির

ফলেই হইয়াছিল বলিয়াই আমি বিশ্বাস করি। এখন আমি এখানে তাঁহাদেরই আশ্রয়েই ছিলাম।

বৈদান্তিক সাধুর কাছে পুড়া ও হালুয়া প্রসাদ পাইবার পর যে তীক্ষ্ণ শ্লেষের অঘাত পাইয়াছিলাম তাহাতে আমার অন্তরে একটা ক্ষত উৎপন্ন করিয়াছিল। ওখান হইতে আমার আশ্রয়ে, সেই ইনস্‌পেকটার সাহেবের বাসায় আসিয়া জননীর সঙ্গে মিলিয়া যখন বলিলাম, তাঁহার স্নেহ মাখানো কথায় আমার অন্তরস্থ আঘাতের তাপটি জুড়াইয়া গেল। তিনি এখন সহজ কথায় বুঝাইলেন,—ওদের ঐ রুক্ষ ভাবটা এই পাহাড়ের গুণ, ঐ মানুষ যদি কিছুদিন গিয়ে আমাদের দেশে বাস করে তাহলে ওদের ভিতরটা সরস হয়ে যাবে, জানো বাবা, ওদের ছক্ বাঁধা জীবন যে, ওরা অন্য দিকটা, সংসারের সহজ, সরল, স্নেহ ভালবাসার মহিমা বুঝবে কি করে? এইভাবে জননী এমন কয়টি কথা বলিলেন যাহাতে বুঝিলাম, আমাদের দেশের সংসারী নর ও নারীর মধ্যে এমনই শক্তিশালী ব্যক্তি আছেন যাঁরা নিজ জীবনে একজন সন্ন্যাসী বৈদান্তিকের তুলনায় কম জ্ঞানী এবং ভক্তিমতি নন। এক কথায় জননী উহাদের রুক্ষতা এবং স্নেহ ও প্রেমহীন কঠিন নিগড়ে বাঁধা জীবনের কথা সহজেই বুঝাইয়া দিলেন যে, ওদের কথায় আঘাত পাইয়া দুঃখী হইবার সঙ্গত কোন কারণ নাই। এমন অদ্ভুত ব্যাপার দেখি নাই। সাধু সঙ্গ ললুপতার জন্যই যেমন এক দিকে একটা আঘাত পাইলাম যতই দুঃসহ হোক, তেমনই আবার অন্যত্র শান্তির প্রলেপও সেই যোগাযোগের অপর দিকটা আমার যেন চক্ষু খুলিয়া আমাদের মানুষ সমাজের একটা দিক উজ্জ্বলরূপে দেখাইয়া দিল।

যাহা হউক তৃতীয় দিনেও মনের আনন্দে উত্তর কাশীর সকল স্থান দেখিয়া লইলাম।

এটুকু বুঝিলাম, যে ভাবের লোক সমাগম আরম্ভ হইয়াছে আর বর্ত্তমান শিক্ষিত সভ্য সমাজের এই দেব স্থানের উপর নজর পড়িয়াছে,—এবং সভ্য জগতের ব্যবহারিক সুখ সচ্ছন্দের ব্যবস্থা এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায় প্রসার আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে মনে হয় উত্তর কাশীর দৈবসম্পৎ থাকিতে পারিবে না, উহা দ্বিতীয় ডেরাদুনে পরিণত হইতে দীর্ঘ কাল লাগিবেনা।

কাল এখান হইতে যাইব শুনিয়া মিশনের এক ব্রহ্মচারী কর্ম্মী আমার সঙ্গ লইবেন, তিনিও গঙ্গোত্তরী যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন এবং আমি তাহাতে রাজী আছি কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার কথা শুনিয়াই আমার মনে হইল আসলে ইঁহার কখনও যাইবার ইচ্ছা নাই। যখন এতটা কাছে আসিয়া এবং এতদিন থাকিয়া মাত্র এক সপ্তাহ কালের যাতায়াত গঙ্গোত্তরী ঘুরিয়া আসার ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই তখন, এখনও উহা ঘটিবে না। এখন ব্যবস্থার কথা লইয়া অনেকক্ষণ কাটাইয়া যেন যাত্রার

আনন্দ অনেকটা ভোগ করিয়া লইলেন। তারপর পর দিন সকালে যাইবার সময়ে, হঠাৎ একটি ভদ্রলোকের হাতে একখানি পত্র দিয়া পাঠাইলেন তাহাতে লেখাছিল, কি জানেন উপস্থিত যাওয়া ঘটিলনা, পরে কোন সময়ে আমি যাইতে চেষ্টা করিব. বর্ত্তমানে আপনাকে একলা যাইতে হইল বলিয়া আমি দুঃখিত। এক শ্রেণীর লোক, তাঁরা কোন কর্ম্মে প্রথমে এমনই উৎসাহ অনুভব করেন আর তারই সঙ্গে সঙ্গে কল্পনায় সেকাজের আনন্দ উপভোগটুকু করিয়া লন, শেষে আর সে তাত থাকেনা। এখন পত্রবাহক চুপি চুপি বলিলেন ; আপনি যদি আজ থাকেন তা হলে আমি কাল আপনার সঙ্গে যাবো, আর আমার মাসিও যাবেন। আমি বলিলাম, আমি তিন দিন কাটিয়েছি আর দিন কাটতে তো ইচ্ছা নাই, এখন আজ যাত্রা করি, আপনাবা ঠিক ঠাক করে কাল যাত্রা করবেন। তারপর আরও বলিলাম যে, আপনার মাসি কিরূপ শক্ত-সমর্থ জানিনা, এ পথে ভৈরবঘাটির চড়াই শুনেছি বড় বিষম, সে সব ভেবে চিন্তে হিসাব করেই যাবেন। তবে ডাণ্ডি বা ঝাপান যদি ব্যবস্থা করতে পারেন তো কথাই নাই। তিনি বলিলেন, তাতে আরও দেরী হবে, আমরা কাল বেরোতে পারবোনা। তা নাইবা হোলো, ভাল ব্যবস্থায় দুই এক দিন বেশী সময় যায় তো তাতে ক্ষতি কি ? জানিনা, আমার কথা তাঁহার মনঃপূত হইল কিনা। আমি কিন্তু আর অপেক্ষা করিতে রাজী ছিলাম না।

দুই

মনেরী—১০ মাইল

উত্তর কাশী হইতে প্রথম পড়াও, মনেরী চটি ১০ মাইল মাত্র। স্বর্গরাজ্যের মধ্যে যেন চলিতেছি। উত্তর কাশী হইতে যাত্রা করিয়া পথে সর্ব্বক্ষণই আমার চিত্তে ঐ সাধুর কথাই আন্দোলিত হইতে ছিল, বোধ হয় কোন এক মুহূর্ত্তও ভুলিতে পারি নাই। বোধ হয়, ওখান হইতে এই ক্ষুদ্র পড়াও গাঙ্গোরী পর্য্যন্ত এই তিনটি মাইল সর্ব্বক্ষণ ভাবিয়াছিলাম। আমাদের এ পথটিও সুন্দর, চড়াই উৎরাই বর্জ্জিত, প্রায় সোজা রাস্তা, মাঝে মাঝে জঙ্গল, আর হিমালয়ের দেওদারে অলঙ্কৃত। আরও তিন মাইল চলিয়া নইতালে আসিয়া পৌছিলাম। প্রায় ভাগিরথীর তীরে তীরেই সারা পথটা। কি আনন্দময় অনুভূতি একটা সঙ্গে আনিয়াছিলাম স্বর্গের আনন্দ উপভোগ করিতে করিতে আরও চার মাইল আসিয়া দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইলে মনেরীতে আসিয়া ধর্ম্মশালায় উঠিলাম। চটিও আছে এখানে, বেশ অনেক যাত্রীও ছিল তখন।

পূর্ব্ববঙ্গের ঢাকা কলেজের এক ছাত্র, নামটি তাহার সুশীল কৃষ্ণ বসু, তেইশ চব্বিশ বৎসর বয়স, বেশ সুন্দর মূর্ত্তি, পুষ্টিপুষ্ট বলিষ্ঠ-শরীর ; অতীব সাহসী তাহার প্রকৃতি।

অনেকটাই ইউরোপীয় মাউণ্টেনিয়ারদের বিবরণ পড়িয়া তাহার একটি অসাধারণ আত্মবিশ্বাস

জন্মিয়াছে, সেই বিশ্বাস লইয়া সে এবারে হিমালয় পর্য্যটনে বাহির হইয়াছে। আগে

যমুনোত্তরী গিয়াছিল, যে পথে আমরা গিয়াছিলাম এবং ফিরিয়া গঙ্গোত্তরীর পথে আসিয়াছি সেও সেই পথেই আসিয়াছে। অধিকন্তু মধ্যে, গঙ্গোরী হইতে ডোতি-তাল, এ অঞ্চলের একটি বিখ্যাত হ্রদ দেখিয়া আসিয়াছে। কত গল্পই করিল। সে সকল এমনই লোভনীয় যাহাতে আবার কতক পথ ফিরিয়া আমারও সেই হ্রদ অঞ্চল দেখিতে ইচ্ছা জাগিতেছিল। সেই হ্রদের পরিধি দুই হইতে আড়াই মাইল হইবে। তাহার তীরে সাধু এবং সিদ্ধ যোগিগণের আশ্রম। এমন পবিত্র ভূমির কথা সে বলিল, সেখানে গেলে ফিরিয়া আসিতে ইচ্ছা হয় না; মনে হয় চিরজীবনই এখানে কাটাইয়াদি। সে হ্রদের জল এমনই স্বচ্ছ, এমনই মিষ্ট স্বাদ, তাহা সহজে আমাদের ধারণাতেই আসিবেনা। একে যৌবনের উম্মাদনা তাহার উপর এই হিমালয়ের প্রীতি, দেখিলাম, এমন যোগাযোগ ভারতের কোন প্রদেশের কোন বিদ্যার্থীর পক্ষে দুর্লভ।—অথচ সেই যুবার মধ্যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন প্রকার কৃত্রিমতা নাই,এমন সরল,এমন নিঃশঙ্কোচ দেখি নাই;—দেশ পর্য্যটনে আসিয়াছে কোন তীর্থ সংস্কার লইয়া আসে নাই। সে আজই এখান হইতে চলিয়া যাইবে, মহা আনন্দেই সেই আয়োজনে ব্যস্ত। আমার মনে মনে তাহার সঙ্গে যাইতে ইচ্ছা হইতে লাগিল কিন্তু আমি আজ তো যাইতেই পারিবনা,—কাল না হয় পরশু যাইব, স্থানটি বড়ই আমার ভাল লাগিতেছিল। কিন্তু এই সুশীল থাকিবেনা। আশ্চর্য্য বিষয় এই যে, দেশ হইতে এত দূরে হিমালয়ের মধ্যে আসিয়া তাহার একজন স্বদেশবাসীর প্রতি এমন আকর্ষণ নাই যে, উভয়ে যুক্তভাবে গঙ্গোত্তরী ক্ষেত্রটি দর্শনের আনন্দ সম্পূর্ণ হয়; দু'জনেই যখন একইস্থানে যাইব।—এতদূরে একজন আপন দেশবাসীকে পাইয়া আমার নিশ্চিৎ ধারণা হইয়াছিল যে শেষ পর্য্যন্ত আমরা কখনও বিচ্ছিন্ন হইব না,—যেহেতু আমরা অন্ততঃ একই উদ্দেশ্যে বাহির হইয়াছি। কিন্তু দেখিয়া বিস্মিত হইলাম যে আমার অস্তিত্ব তাহার প্রাণে কোন সাড়াই জাগাইলনা। আর অনুরোধও করিলাম না। সে যাইবার সময় আমায় এই কথা গুলি বলিয়া গেল,—আপনি এখানে দুই একদিন থাকুন, বিশ্রাম করুন, তারপর যাবেন। আমি একটু একলা থাকতে, বেড়াতে, ঘুরতে ভালবাসি, সঙ্গী থাকলে আমার কোন কাজে সুখ হয় না। একটু থামিয়া তারপর একটু ভাবিয়া,—আবার বলিল,—দেখুন,—আবার হয়তো পথে কোথাও দেখা হয়ে যাবে, হয়তো হবে না,—না হোলেও তার জন্য আমার কোন দুঃখ নাই। আমি একটু হার্ড আর প্রাকটিক্যাল, সেন্টিমেণ্ট্যাল মোটেই নয় যে জন্য বাঙ্গালীর একটা দুর্ণাম আছে। একটু হাসিয়া, গট্ গট্ করিয়া চলিয়া গেল। হ্যাফ প্যাণ্ট হাফসার্ট, ওয়াটার প্রুফটা কাঁধে এবং হাতে লম্বা লাটি। চমৎকার, আমায় আনন্দ ও দিয়া গেল, যখন একান্তই গেল। মাত্র একবেলার সম্পর্ক তার সঙ্গে।

মনেরীতে আমি সেদিন ও রাত্রি কাটাইয়া পরদিন সকাল সকাল আহারাদি সারিয়া

যাত্রা করিলাম। মনেরী হইতে আট মাইল ভাট্ওয়ারহি। পথটি ভালো, সামান্য একটু চড়াই মধ্য পথে আছে, না হইলে সুন্দর পথ, কোন দুর্গমতা নাই। গঙ্গার কাছে কাছেই এখন সুন্দর গম্ভীর দৃশ্যের মধ্যে দিয়া পথ;—শ্রমের কথা মনেই হয় না। আমি খালি পায়ে দ্রুতগতি আসিয়া সহজেই শেষদিকে একটা পথের বাঁক ঘুরিয়াই ভাটোয়ারী গ্রাম দেখিতে পাইলাম। মন্দির একটি প্রথমেই নজরে পড়িল, তারপর একটু চড়াইয়ের উপর কয়েক ঘর গ্রাম্য বসতি—মন্দিরটি একটু নীচে, আবার তারও একটু নীচে রাস্তার ওপাশে টিরী রাজার স্থাপিত একটা চমৎকার বাঙ্গলা। আরও কতকটা নিচের দিকে একটি ধর্মশালা আছে। আমার বাহক বন্ধু, পথের সাথী সেদিকেই চলিল, কাজেই সেইখানেই উঠিলাম। ঘর দুইখানি, বড় বারন্দাও আছে বেশ চওড়া। উহারই একপাশে একটু রাঁধিবার জন্য কয়েকটা পাথর আছে চমৎকার চুলার কাজ করে। আমার মুরুব্বি সব কিছুই জোগাড় করিয়া দিল, ঘি, আলু, ও চাল, দাল, দই লইয়া আসিল মুদীর দোকান হইতে। সব কিছু ব্যবস্থা হইয়া গেলে, চালে ডালে, চাপাইয়া তাহাতে আলু ছাড়িয়া অল্পক্ষণেই চমৎকার খিচুড়ির পাক নামাইলাম। তখনই খাইলাম না,—এখনকার মত উহা রাখিয়া আমি একটু বাহিরে ঘুরিয়া, ফিরিয়া, দেখিয়া আসিতে বাহির হইলাম।

গ্রামখানিতে ছোট ছেলে-মেয়ে, যুবক-যুবতী, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, সকল রকম অধিবাসীই দেখিলাম; মনে হইল ইহারা সুখী।—সরল, সহজ জীবন, ক্ষেতিবাড়িই সম্বল, তাহাদের যেটুকু আছে তাই ভালো আর কিছু চাইনা, যেন এই মনোভাবটাই প্রবল। একটি ছোট্ট পাঠশালাও আছে একটি যুবা মাষ্টার বেত্রহস্তে শিক্ষা দিতেছে,—বেশ কাজ চলিতেছে। প্রায় ঘণ্টাখানেক ঘুরিয়া ফিরিয়া, স্নান করিয়া ভোজনান্তে একটু গড়াইয়া লইলাম তারপর উঠিলাম। এখনই চলিব কি না তাই ভাবিতে ছিলাম কারণ, আকাশে বেশ মেঘ জমিয়াছিল। বন্ধু বলিল, –ও মেঘে এখন কিছুই হইবেনা, হয়তো রাত্রে বরখা নামিতে পারে ততক্ষণে আমরা এখান থেকে গাঙ্গনাণীতে পৌছেই যাব। অবশ্য আমি তখন আমার ভাষায় বলিলাম, বহোত আচ্ছা। সে তাহার ভাষায় বলিল, জি হাঁ, মহারাজ।

ভাটওয়ারী হইতে গাঙ্গনানী নয় মাইল। পথে ভূক্কি নামক গ্রামখানি ছয় মাইল, তপ্ত ঋষিকুণ্ডের নিকটে। মধ্যে গঙ্গা, এখন বাঁদিকে তীর পথ ধরিয়াই চলিতেছি। ওপারের পাহাড় ক্রমে যেন কাছেই আসিতেছে, এই ভাবে আনন্দে, সহজ সরল পথে আমরা গঙ্গা দেখিতে দেখিতে আসিতেছি, সেই কল্লোল শুনিতেছি, মধ্যে মধ্যে বিশাল প্রস্তর খণ্ড সমাকুল স্রোত পথে জলোচ্ছস্ সেই সকল পাথরের উপর আছাড় খাইতে খাইতে বিদ্যুৎ গতিতে ছুটিতেছে নীচের দিকে। উহা রোধ করিবার সাধ্য কাহারও নাই, দেখিতেছি ঐ দুরন্ত স্রোত উত্থিত শব্দোচ্ছাসই যেন আমাদের গন্তব্যের পথে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে।

আত্মহারা হইয়াই চলিতেছি ঐ শব্দ ও দৃশ্যের মধ্যে ডুবিয়া। ক্রমে ভুক্তি নামক ঐ পার্ব্বত্য গ্রামের কাছে, ছয় মাইলের মাথায় ওপারে যাইবার সেতু মুখে পৌছিলাম। এবার ঐ সেতু পার হইয়া গঙ্গাকে বামে রাখিয়া যাত্রা করিলাম। লোহার তারের কাছিতে ঝোলা পুলের দৃশ্যটি অপূর্ব। বিশেষতঃ গভীর খাতে গঙ্গার তীব্র গতিশীল মূর্ত্তি তাহার প্রায় পঁচিশ ত্রিশ ফিট উঁচুতে ঐ পুল, কি সুন্দর। এবার গঙ্গা বামে রাখিয়া পূর্ব্বতীর দিয়া পথ। সুন্দর পথ, দেওদার বন এ পারে ও পারেও দেখা যাইতেছে, সুগন্ধ তাহার বাতাসে ছড়াইতেছে, দিব্য দৃশ্য ও দিব্যগন্ধ উপভোগ করিতে করিতে চলিতেছি। ক্রমে ছয় মাইলের মাথায় আবার একটি ঐ রূপ দীর্ঘতম সেতুর উপর আসিয়া পড়িলাম এবং আবার গঙ্গা পার হইয়া—পতিতোদ্ধারিণীকে দক্ষিণে রাখিয়া চলিতে লাগিলাম। এইভাবে কতক ক্ষণে আসিয়া পড়িলাম ঋষিকুণ্ডের ধারে। একটি উষ্ণ প্রস্রবণ, তার নাম ঋষিকুণ্ড ; কি অপূর্ব্ব দৃশ্যই এই কুণ্ডটি বেড়িয়া সৃষ্টি হইয়াছিল। পাশে কিছু দূর নীচে তুষার গলিত দ্রবময়ীর এত নিকটেই উষ্ণ জলস্রোত প্রবাহিত, অবশ্য ঐ স্রোত আপন ধারায় আবার ঐ গঙ্গাতেই পড়িয়াছে। অদ্ভুত প্রকৃতির খেলা। এ সকল উষ্ণ স্রোতের জলে গাত্রমার্জ্জন ও স্নানে শরীর নীরোগ হয়। হিমালয়ের যেখানে যেখানে তুষার রাজ্যের মধ্যে শীতল জলস্রোত ঠিক তার পাশেই প্রায় স্থানেই উষ্ণজল প্রস্রবণও দেখিয়াছি। যাহা হউক এইভাবে অপূর্ব্ব বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া চলিতে চলিতে এবার অল্প কতক ব্যবধানে আমরা গাংনানীতে পৌছিয়া গেলাম।

এই গাংনাণীর মাহাত্ম্য আছে। প্রথমে দৃশ্যের মাহাত্ম্য। যে পথে আমরা আসিলাম, সেইপথের উপরেই ধর্ম্মশালা, চটি, যাহা কিছু সব। সেথা হইতে নামিয়া একটু আসিলেই দৃশ্যের ব্যবধান ঘুচিয়া যায় ;—তখন সম্মুখে দেখা যায় পাহাড়ের বিচিত্র দৃশ্যের মধ্যে একটি ঝরনা, কতকটা দূর বলিয়া এপার হইতে ছোট মনে হয় কিন্তু পরপারের ঐ ঝরণাটি ছোট নয়, তাহার জল কতক সোজা যেন দীর্ঘ স্বচ্ছ এক শুভ্র ধূমকেতু তারপর নীচের দিকে নানা ভাবে বিভক্ত হইয়া আসিয়া গঙ্গায় পড়িতেছে। উপরে নীচে, দুই ধারে শ্যামল তরুলতা পূর্ণ বনভূমি, দীর্ঘ পাইন বা দেওদার মধ্যে মধ্যে দাঁড়াইয়া, দ্রষ্টা প্রহরীর মত আমাদিগকে তাদের পানেই টানিতেছে। আজ সেই ক্ষেত্রেই বাকী কালটুকু কাটাইয়া আনন্দে ধর্ম্মশালার একাংশে রাত্র যাপন করিলাম। শীত ছিল বেশ, ঘরে আগুনও ছিল। অন্য যাত্রী ছিল না। আমার সাথী, আমাকে কোন দুঃখ পাইতে দেয় নাই।

পরদিন প্রাতে আবার এক দৃশ্য দেখিলাম, যাহা কাল বৈকালে এক ঐশ্বর্য্যশালী সম্রাটের ন্যায় আমার দৃষ্টির সম্মুখে ধরা দিয়াছিল তাহা আজ প্রত্যূষে ক্ষীণ শুভ্র বর্ণাচ্ছাদিত মহিয়সী পার্বতীর মত আরাধনার ধন রূপেই ধরা দিল আমার মত একজনের স্থুল দৃষ্টি সম্মুখে

তিন

সুখ্‌খি-ঝালা—আরও তিন মাইল

গাংনানী হইতে সুখ্‌খি ৯ মাইল মাত্র পথ ; ঝালা,—আরও তিন মাইল। আমরা বরাবরই যে ধরণের দৃশ্য দেখিতে দেখিতে এপথে আসিতেছিলাম এবার গাংনানী হইতে তাহার কিছু ব্যতিক্রম দেখিতে পাইলাম। আপেল গাছ মধ্যে মধ্যে পথের আশপাশের ক্ষেত্রে দেখা যাইতে লাগিল, দেওদার বা পাইনের রচনা কম এবং অন্যান্য গাছ বেশী কিন্তু যেটি বিশেষ ব্যতিক্রম তাহা, একটানা চারটি মাইলের এক চড়াই। ক্রমান্বয়ে উঠিয়া যাও কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে হইবেনা। এক পাশে খড্‌ অপর পাশে জঙ্গল, ফল ও ফুলে মধুময়। প্রথমে খানিক সহজ পথে লোহারিনাগ নামক স্থানে বিশ্রাম করিতে বসিলাম। পথের ধারেই এক সাধু, সজ্জনানন্দ স্বামীর আশ্রম। কাঠের পাটা দিয়া তৈরী ঘর আবার কতকাংশ তাহার কর্ম্মশালার আয়তন দেখিলাম। স্বামী উহা পাকা ইমারত বানাইতে চান তাই টাকার বড়ই দরকার। আহার ঔষধ দুই কাজই হয় এমনই উদ্দেশ্য লইয়া স্বামীজি আসরে নামিয়াছেন। ঐ স্থান হইতে দৃশ্য বড়ই মনোরম, স্বধু সুন্দর বলিলে সব বলা হয় না। স্থানটি তো ভালই কিন্তু আমাদের বসিলে তো চলিবে না। সেখান হইতে সোন্‌গঙ্গা হইয়া ঐ চারটি মাইল চড়াই অতিক্রম করিয়া সুখ্‌খি নামক গ্রামে পৌছিয়া গেলাম। কিন্তু আমাদের সাথী বলিলেন, ঔর তিন মিল,—ব্যস্‌ ঝালা পৌছ জায়গা,—অব ইহাঁ যাস্তি মৎ বৈঠিয়ে সাহাব, ই জাগাহা অচ্ছা নহি।

এতটা চড়াইয়ের উপরও যদি জায়গা অচ্ছা না হয় তো কোথা হইবে তাহা আমার বুদ্ধির অজ্ঞাত। তাহার মন্তব্য যাহাই হউক না কেন আমায় উঠিতেই হইল। ঝালা পৌছাইতে এক মাইল চড়াই আরও উঠিয়া মাইল খানেক নামিয়া একনিঃশ্বাসে সোজা ঝালা গ্রামে গিয়া উঠিলাম।

ঝালা গ্রামের বিশেষ মাহাত্ম্য নাই, পঁচিশ ত্রিশ ঘর অধিবাসী লইয়াই গ্রাম। যে ধর্ম্ম শালাটি আছে তাহা কাষ্ঠ নির্ম্মিত। মুদির দোকানও আছে—আর বানিয়াদেরই রাজ্য এখানে প্রত্যেক পড়াওটি। কারবারে বেশী লাভ হইলে দান ধর্ম্ম করে তাহারাই, লোকসান হইলে দ্বার বন্ধ করিয়া দেয়। এ পথে পয়সা খরচ করিবার মত যাত্রি যাহারা আসে তাহাদের তো কথাই নাই, উহাদের পিছনে আর এক শ্রেণীর যাত্রী থাকে তাহারা অপরের অনুগ্রহ বা ভিক্ষার উপর নির্ভর করিয়াই তীর্থ দর্শন ধর্ম্ম সম্পূর্ণ করে। এ প্রথা আবাহমান কাল হইতেই চলিতেছে, আমাদের এই ভারতের ইহাই বৈশিষ্ট্য। সাধারণতঃ ইহারা সংসারী নয় বলিয়াই তাহাদের একটা জোর দাবী থাকে গৃহস্থ পরিবারের উপর, আর প্রতিগ্রামের ব্রাহ্মণ ছত্রি অপেক্ষা বানিয়া ব্যবসায়ীর উপর ঐ সকল ভুখা, সম্বলহীন

তীর্থকামীদের ভরণ পোষণের জন্য ভারটা পড়ে বেশী; আর সরলমনা, ধর্ম্ম প্রবল

হিমাচল পর্ব্বতবাসী গৃহস্থ বৈশ্যগণ এই দান কর্ম্মের ভার সহজ কর্ত্তব্য বলিয়াই বহন

করে, কোন বিরাগ নাই। সময় সময় প্রতিযোগিতাও লাগিয়া যায় এই দান কর্ম্মে, অবশ্য তাহাতে গৃহীতারই লাভ।

যাহা হউক আমরা ঝালা গ্রামের ধর্ম্ম শালায় রাত্র কাটাইয়া পরদিন প্রাতে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়াই যাত্রা করিলাম। এখান হইতে ফল,—আপেল, পিয়ার, নাশপাতি, খোবাণী, পীচ এই সকল ফলের গাছ একটু ঘন ঘনই দেখিতে দেখিতে আর দৃশ্যের মধ্যে আপনাকে ভুলিয়া যাত্রা করিলাম। এখন ঠিক আপেলের সময় নয়, অক্টোবর নভেম্বরে প্রচুর পাওয়া যায়, তবে এখন দেখিলাম যে গাছভরা ফল ধরিয়াছে এইমাত্র। এখন বরষার দিনে ক্যা ফলটাই বেশী বেশী দেখিলাম এবং পাইয়াও ছিলাম প্রচুর।

আমরা হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ স্তরের নিকটবর্ত্তি হইতেছি, দৃশ্য সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা এই স্তরেই দেখিতে দেখিতে যাইতেছি। কিন্তু যখনই মনে হইতেছে আমাদের এই তীর্থ দর্শন শেষে আবার সেই কুৎসিত, পঙ্কিল কলিকাতার রৌরবে ফিরিতে হইবে, এখানে দীর্ঘ-কাল থাকিবার অধিকার পাইব না তখনই বিষাদে অন্তর কাতর এবং প্রাণ কাঁদিয়া উঠিতেছে। যাহাদের পশ্চাতে স্ত্রীপুত্রাদি সংসার বাঁধা আছে তাহারা এই স্বর্গরাজ্যের অধিকারী হইতে পারে না, কারণ তাহারা অযোগ্য। একবার দেখিয়া যাও আর দেশে ফিরিয়া দম্ভভরে জাহির কর পাঁচ জনের কাছে আর তাহারই স্মৃতি অবলম্বনেই দিন কাটাও;—ধনৈশ্বর্য্যময় সংসার নামক আশ্রমের জীব যারা তাহাদের ইহাপেক্ষা আর বড় অধিকার কী থাকিতে পারে।

এই পথে যে তিনটি স্থানের মধ্যে দিয়া আমরা জঙ্গলায় উপনীত হইলাম তাহাদের কথা না বলিলে সত্যই বড় অবিচার হইবে, এবং ভবিষ্যতে যাঁহারা আসিবেন তাঁহাদের নিকট অপরাধী প্রতিপন্নই হইব। যত কিছু পুণ্য আজ দর্শনেই কেন্দ্রীভূত হইল;—আমরা সুস্থ শরীর মন এবং আনন্দপূর্ণ প্রাণে ঝালা হইতে হরশিলা ও ধারেলী প্রভৃতি পুণ্যস্থান হইয়া জঙ্গলার পথে পা বাড়াইলাম। এই নয় মাইল পথে চলিতে চলিতে প্রথমে মাত্র আধ মাইলের মাথায় যে এক প্রয়াগের মধ্যে নামিয়া ছিলাম নামটি তার শ্যাম প্রয়াগ। শ্যামগঙ্গা নামক একটি প্রবল ধারা ভাগিরথীর সঙ্গে মিলিয়া দৃশ্যতঃ এক জীবন্ত তীর্থের সৃষ্টি করিয়াছে। দুইটি ধারা এখানে মিলিয়াই প্রখর গতিবেগে পাঁচ, সাতটি ধারায় দুর্দ্দান্ত বেগে ছুটিতেছে;—দেখিতে দেখিতে তাহাতেই কতক্ষণ ডুবিয়াছিলাম;—তারপর নেশায় বিভোর, চলিলাম। এইভাবে স্বর্গের সৌন্দর্য্য ভরা এই ভূমির মধ্য পথে আসিয়া প্রায় দুই মাইলের মাথায় গুপ্তপ্রয়াগ। মহিমাময় অপর প্রয়াগের সহোদর কেবল বহুধারায় বিভক্ত নয়,এইমাত্র পার্থক্য; আর এই যে ধারাটি এখানে গঙ্গার অঙ্গীভূত হইয়াছে তাহার নীল, অতীব স্বচ্ছ সলিল, গঙ্গার সঙ্গে মিলিয়া এক হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বর্ণ ও গতিতে গঙ্গা হইয়া গেল। এই মিলন দেখিতে দেখিতে ইহার পরে আরও আধ মাইল চলিয়া

আমরা হরশীলায় পৌছাইয়া নিঃশ্বাস ফেলিলাম। নিঃশ্বাস ফেলার এই ব্যাপারে সত্যটুকু এই যে, আমাদের মন এবং কোনও জ্ঞানেন্দ্রিয় এক হইয়া গেলে অর্থাৎ আমরা একাগ্র হইলেই সঙ্গে সঙ্গে শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়, তখন আমাদের দেহ বোধ থাকে না। যেই মাত্র দেহ বোধ আসে তখনই একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসে। ইহা সকলকারই হয় তবে লক্ষ্য থাকেনা তাই আমরা জানিতে পারি না। জানিবার দরকার আছে বলিয়াও মনে হয় না, তবে এটা হয় প্রকৃতির সৃষ্টিতে এবং এই শরীরের নিয়মে। এটুকু জানিয়া রাখা ভালো।

এই হরশিলার মাহাত্ম্যকথা কি আর বলিব,—স্থানীয় দৃশ্যের সঙ্গে এই নামের যোগা-যোগ, প্রাণ আমাদের পূর্ণ, সেইক্ষণেই যেন শ্রীহরিহরের পাদপদ্মে সমাহিত করিয়া দিল। সবিগ্রহ শ্রীলক্ষ্মী নারায়ণের একটি মন্দিরও আছে। এখান হইতে অনেকক্ষণ নড়িতে পারি নাই। এদিক ওদিক ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে প্রায় দুই ঘণ্টা কাটাইলাম, প্রাণ যেন আর এ স্থান ত্যাগ করিতে চাহে না ;—ইচ্ছা করিলে থাকিতেও পারিতাম কিন্তু এ দিকে অত্যন্ত নোংরা বিভৎস মূর্ত্তি তির্ব্বতীদের বেশ বড় একটা দল থাকে, তাদের জাট বলে, তাহারা গ্রামখানি নরকে পরিণত করিয়াছে। স্থানের মাহাত্ম্য যেন এই ভয়ঙ্কর মানুষগুলির আবির্ভাবে উবিয়া গেল। তবে একটু আশার কথা এই যে ইহারা যাযাবর, কোন সময়ে ডেরা উঠাইয়া উধাও হইতেও পারে। এই সম্ভাবনার কথাই গ্রামবাসী বেশী করিয়া ভাবিতেছে এবং ইহাদের অনাচার সহ্য করিতেছে। সুধু অনাচারের কথা বলিয়া ইহাদের কথা শেষ করিলে ঠিক হইবে না বোধ হয় একটু পাপও হইবে। এই জাট জাতি বা দলটির অসাধারণ শিল্প অধ্যবসায়, বিশেষতঃ ইহাদের মেয়েরা দিবারাত্র পরিশ্রম করে। একপ্রকার পাতিবার আসন এবং নানা প্রকার উৎকৃষ্ট কম্বল প্রস্তুত করিতে ইহারা অসাধারণ দক্ষ। নানা প্রকার পশমের অর্থাৎ পশুলোমের কাজ করিয়া থাকে এবং ভাল মালদার যাত্রী পাইলে তাহাদের বেশ দামে বিক্রয় করে। যে সকল দ্রব্য তাহারা প্রস্তুত করে দেখিলে, না কিনিয়া যেন থাকা যায় না। উহারা ঐ লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দিরের নিকটে ঘুরিয়া বেড়ায়, হাতে পিঠে কিছু কিছু দ্রব্য লইয়া, প্রতিদিন প্রাতে, দ্বিপ্রহরে, বৈকালে, যে সময়টা যাত্রীরা আসে। কিন্তু এখানে একটি মাত্র ছোট ধর্ম্মশালা, তা ছাড়া এটা থাকিবার জন্য প্রশস্ত পড়াও নয় বলিয়া ইহাদের মাল লইয়া দূরে দূরেও যাইতে হয়। আমার মনে হয় এই স্থানটির দৃশ্যই ইহাদিগকে মুগ্ধ করিয়া এখানে টানিয়া রাখিয়াছে। যাহা হউক আমরা মুগ্ধ হইলেও এখানকার মায়া কাটাইয়া শেষ পর্য্যন্ত পথের বাহির হইতেই হইল। সুন্দর পথে অপর এক সেতু উত্তীর্ণ হইয়া গঙ্গার এপারে আসিয়া ধারেলীর পথ ধরিলাম এবং প্রায় আড়াই মাইল চলিয়া যথাকালেই ধারেলীতে পৌছিয়াও গেলাম।

বেশ বড় গ্রামখানি, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বসতি তবে বৈশ্যই প্রধান। ধারিওয়ালেরাও থাকে। তাহারা নিজেদের ক্ষত্রিয় বলিয়াই পরিচয় দেয়, ইহারা অসাধারণ কর্ম্মদক্ষ জাতি এবং বৃত্তিতে বৈশ্য ব্যতিত অন্য জাতি নয়। প্রতি বৎসরে প্রায় দশ মাস ইহারা তিব্বতেই থাকে ব্যবসায় উপলক্ষে। ধারিয়াল বলিতেই যেন লুই নামক স্থূল পশমের শীতবস্ত্র প্রস্তুতের কেন্দ্রই বুঝায়। ইহা সত্যও বটে।

ধারেলীর বৈশিষ্ট্যও আছে এবং মাহাত্ম্যও আছে। আবার এখান হইতে দেখা যায়, পরপারে বেশ বড় একখানি গ্রাম, তাহার নাম মুখবা, ঐ গ্রামে একটি মঠও আছে আর ঐ গ্রামেই গঙ্গোত্তরীর পাণ্ডাগণ বাস করে। যখন প্রবল শীতে গঙ্গোত্তরীর মন্দিরাদি তুষারে ঢাকিতে আরম্ভ করে তখন মন্দিরের বিগ্রহ এবং অন্যান্য মূল্যবান যাহা কিছু লইয়া পাণ্ডারা চলিয়া আসে এবং ঐ গ্রামেই রাখিয়া দেয়। এখান হইতে দেখিতে এমনই সুন্দর, গ্রামখানি ঘুরিয়া আসিতে লোভ হয়। তবে পাণ্ডারা কার্য্যোদ্ধারের জন্য এই ধারেলী গ্রামেই যাত্রীদের অপেক্ষায় থাকে, আসিলেই নিঃসঙ্কোচেই আক্রমণ করে। ইহারাও খাতা বাহির করিয়া তোমায় আক্রমণ করিবে। সেই মোটামোটা তুলট কাগজের খাতায় লিখিত বংশ পরিচয় বাহির করিলে তাহা এড়ানো একটা দায় বিশেষ।

যাহা হউক ধারেলী গ্রামখানি সাধারণ রাজপথ হইতে একটু চড়াই উঠিয়া পাহাড়ের অঙ্গে এক হইয়াই আছে। এখানে আর একটি চমৎকার বস্তু দেখিলাম,—দুইটি সুন্দর ছোট ছোট শিব মন্দির। উহার রচনা মামুলী এ অঞ্চলের অপরাপর মন্দিরের মতই, তবে বৈশিষ্ট্য এই যে উহার পাথরগুলি ঠিক ঠিক মাপে নিখুঁত কাটিয়া উপরে উপরেই বসানো, মসলা দিয়া গাঁথা নয়। এ প্রকার রচনা এ পথে আর দেখি নাই। অপূর্ব্ব রচনা ও গঠন পারিপাট্য। প্রাচীর বেষ্টিত একটি চতুষ্কোণ অঙ্গন, নোড়া নুড়ি পাথরকাঁড়ি সাজাইয়া এই প্রাচীর, তাহার মধ্যে গঙ্গার দিকে মুখ এক সুন্দর তোরণ, উহাতে একটি ঘণ্টা ঝুলিতেছে। ওখান হইতে নামিয়া গঙ্গার ধারে পড়িতে হয়, বেশ উঁচু উঁচু কয়েকটি সুদৃঢ় ধাপ আছে। আর ভাগীরথী জননী, উভয় পার্শ্বেই স্তূপাকার নোড়া-নুড়ির অনতি প্রশস্ত পথের মধ্যে তীব্র বেগে নামিতেছেন।

আমরা এইখানেই, মধ্যাহ্নভোজন শেষ করিলাম এক পাণ্ডার আশ্রমে, তারপর কিছুক্ষণ এদিক দেখিয়া আবার যাত্রা করিলাম পথে। প্রস্তর সমাকুল হইলেও সোজা পথে নামিয়া চলিতে লাগিলাম আনন্দে। যমুনোত্তরী হইতে এতটা পথ আসিয়াছি চলিতে আরামদায়িনী এমন সুন্দর পথ আর কোথাও পাই নাই। বিনা আয়াসেই যেন চলিতেছিলাম। এই ভাবে প্রায় তিন মাইল হাঁটিয়া আবার বিচিত্র এক রন্ধ্র পথে,—আমরা উপস্থিত হইলাম। এখানে দুই দিকে পর্ব্বত খুব কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে মধ্যে ভাগীরথীর শরীর অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ হইয়াছে। প্রায়ই দেখিতেছি যেখানেই দুপাশের

দুইটি অচলায়তন অতীব নিকটবর্ত্তি হইতেছে সেইখানেই ভাগীরথী ক্ষীণ কায়া। যতই ক্ষীণ হোক না কেন কোথাও ছয় সাত হাতের কম প্রশস্ত দেখি নাই। এবারেও আমরা এরূপ একস্থানে আসিয়া আবার গঙ্গা পার হইলাম। এ পুলটিও ঝোলা পুল তবে চল্লিশ ফিটের বেশী দীর্ঘ নয়। পুলের গভীর নীচে গঙ্গা প্রায় চল্লিশ ফিট হইবে দুই পাশে দুইটি সুদৃঢ় প্রস্তর ভিত্তির মধ্যে প্রবাহিনী দ্রুত বহিয়া চলিয়াছে। এই সেতু উত্তীর্ণ হইয়াই খানিক চড়াই ;—ঐ চড়ায়ের উপরেই জঙ্গলা নামক পড়াও। উপরে উঠিতে উঠিতে দেখিলাম একটি অপূর্ব্ব গুহা, আগুণ জ্বলিতেছে তাহার মধ্যে, সম্মুখেই দুই তিনটি সাধুমূর্ত্তি বসিয়া আছেন।

আজ এইখানেই রাত্র যাপন, সুতরাং আমাদের যে কাষ্ঠাবাসের মধ্যে থাকিতে হইবে সেখানে গিয়া স্থান ঠিক করিয়া সব কিছু রাখিবার ব্যবস্থা, তারপর আগুণ জ্বালানো হইল। তখনও বেশ একটু বেলা ছিল, তাই দেখিয়াই দুইজন যাত্রী এখান হইতে চলিয়া গেল। শুনিলাম, এই বেলাতেই ভৈরো ঘাটির চড়াই উত্তীর্ণ হইয়া তাহারা ঐখানেই রাত্র যাপন করিবে। আমাদেরও ত গেলে হয়? বাহক বান্ধব যিনি আমার মুরুব্বি তিনি মুখ ভারি করিয়াই বলিলেন, আজ ঔর না চড়ো জি, ভাবরকা আদমী, যাস্তি চড়নেমে ফাট জায়েগা ছাতি। কথাটা যেন একটা আঘাত, তৎক্ষণাৎ একটা জিদ চাপিয়া বসিল, যাইতেই হইবে;—কেন, আমার ছাতি কি এতই নরম যে একটা চড়াই সহ্য হইবে না? তারা যখন পারিবে আমি কেন পারিবনা? বলিলাম, চলিয়ে জি, হামলোক ভি চড়াই উঠেগা। এ ক্যা বাৎ হৈ, উলোক সিকেগা ঔর হামলোক সিকেগা নহি। তখন সাথী আমার অপ্রসন্ন রোষদুষ্ট মুখের পানে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল, তারপর উঠিয়া আমার কাছে আসিয়া জোড় হাতে বলিল,—রোষ ন' করো মহারাজ! আজ রহ দিজিয়ে, কুছ নকসান নহি হোগা, ফজর ফজর হামলোক কাল দু পহর কি আগে গঙ্গী পৌছ যায়েগা, আপ কুছ ফিকর না করো।

আর রাগ করা চলে না। আনন্দেই, সহজ প্রাণে রহিয়াই গেলাম।

চার

রাত্রে রোটি টিকরা, আলু কি শাক আর আমকি আচার, শেষে ভেলীগুড়ের মিষ্টি মুখ, এই প্রকার উপাদেয় তৃপ্তিকর ভোজনের পর শয্যাগ্রহণান্তর একপাশে এবং একক্লাতে রাত্র কাবার করিয়া শীতল প্রভাতে পক্ষিকুল কাকলীর সঙ্গে গঙ্গাতরঙ্গোচ্ছাস মিলিত অপরূপ ধ্বনী শুনিতে শুনিতে জাগিয়া প্রথমে আমার পথের সাথীর মুখই দেখিলাম। তারপর উঠিলাম। শয্যা ত্যাগ করিয়াই সাথীকে সম্ভাষণ করিলাম ;—সুপ্রভাত জী।

উত্তরে অবশ্য সাথী আমার প্রসন্ন মনে, জী হাঁ, মহারাজ,—বলিয়া মোট ঘাট বাঁধিতে তৎপর হইল। আজ ভৈরব-ঘাটের চড়াই, তারপরই গঙ্গোত্তরী। অবশ্য ঐখানেই

আমার শেষ নয় কারণ আমি মনে মনে গোমুখ যাইবার আকাঙ্খা রাখি, একথা কাহাকেও

বলি নাই। কাহাকেইবা বলিব? এই বাহক মুরুব্বি আমার গাঙ্গী অর্থাৎ গঙ্গোত্তরীর পরে আর এক পাও যাইবে না। সুতরাং লাভ কি তাহাকে বলিয়া? এ অঞ্চলে বাহকদের এক অদ্ভুত বাঁধা বুলি আছে;—তারা বলে, নিজ নিজ অঞ্চল ছাড়াইয়া তুষার রাজ্যে গেলে, কড়া শীতে তারা বাঁচিবে না, নিশ্চয়ই মরিয়া যাইবে। কাজেই এ অঞ্চলের কুলিবাহকের দ্বারা কোন কাজই হইবেনা, না বাহক,—না পথ প্রদর্শক হিসাবে। যাক্ এখন ওসব কথা, উপস্থিত হাত মুখ ধুইয়া চা পান করিয়া আমরা ভৈরবঘাটি যাত্রা করিলাম। প্রথম দিকে বেশ পথ। আনন্দের সুর একটা প্রাণে ক্রয়া করিতেছিল যে আজই গঙ্গোত্তরী পৌছানো যাইবে। হন হন করিয়া চলিয়াছি, সাথী বাহক পিছনে গুটিগুটি আসিতেছে। উত্তরাখণ্ডের মর্ম্মস্থান আমাদের গতি ও লক্ষ্য। প্রায় সওয়া মাইল পথ অতিক্রম করিবার পর আমরা দুইটি পথের সংযোগস্থলে আসিয়া পৌছিলাম;—একটি পথ সোজা গিয়াছে অপর একটি দেখিলাম নীচে নদীর দিকে নামিয়া গিয়াছে। উপরের পথটা নেলাং পাস হইয়াই তীব্বত গিয়াছে এবং ঐটা ট্রেড্ রুট্ আর নীচের পথই আমাদের গন্তব্য গঙ্গোত্তরীর পথ। সুতরাং ঐ পথেই নামিতে নামিতে এক প্রয়াগের নিকটবর্ত্তি হইলাম। এখানে জাঢ় গঙ্গার ছোট কাষ্ঠ সেতু অতিক্রম করিলাম ও ভাগীরথী তীরস্থ পথ ধরিলাম। এখানে উপর দিয়া আরও একটা ঝুলা পুল ছিল তাহাকে ভৈঁরো ঝুলা বলিত। ইহা সেই প্রাচীন লছমন ঝুলার কনিষ্ঠ সহোদর ঐ প্রকার বিপজ্জনকও বটে; এখন আর ঐ পথে কেহ যায় না নীচের পুল দিয়াই কাজ চলিতেছে, পরে পাকা পুল হইবার ব্যবস্থা হইয়াছে, শুনিলাম। ঐ পুল পার হইয়া কতক পথ গেলেই ভৈরব ঘাটির প্রসিদ্ধ দণ্ডবৎ চড়াই সুরু হইল।

এই চড়াইটির বৈশিষ্ট্য এই যে উঠিতে গেলে, সহজ শরীরে একটু সামনের দিকে ঝুঁকিয়াই উঠিতে হয়। সোজা উঠিতে গেলে, ধরিত্রী জননী শরীরটাকে পিছন দিকে টানিয়া চিৎপাত আপন কোলে শোয়াইয়া ফেলিতে চান। অর্থাৎ সোজা উঠিতে গেলে মাধ্যাকর্ষণের টানে পিছন পানে টাল খাইতে হয়। সেই কারণেই ধীরে ধীরে সামনে একটু ঝুঁকিয়া উঠিতে হয়, তাহাতেই আয়াস কিছু কম লাগে, বুকে টান ধরে কম। এই কারণেই ভৈরব ঘাটির চড়াই বুক চাপা, অতীব কঠিন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। তবে ঐ কষ্টকর চড়াই আধ মাইল হইবে তারপর যে পথ তার মধ্যে চড়াই উৎরাই আছে তবে তাহা সহ্য করিতে পারা যায়। গঙ্গোত্তরী পৌছাইতে এই শেষ টুকুই বিষম কিন্তু তা সত্ত্বেও এতটা পথের কষ্ট, পীড়াদায়ক পথের শ্রম এবং দুঃখ যা কিছু, একটি বিশেষ কারণে যাত্রীগণের মনে তিলমাত্র দাগ বসাইতে পারে না, উহা এখানকার ঐ দৈব দৃশ্য যাহা আপন অস্তিত্ব ভুলাইয়া দেয়। তোমার দক্ষিণে বামে ঐ দেওদার কুঞ্জ, তাহার পশ্চাতে ঐ দেখ গাঢ় নীলাকাশের মধ্যে যে অপূর্ব্ব তুষার বিগ্রহ মাথা তুলিয়া রহিয়াছে, আর মধ্য

পথে দূরত্ব হেতু ঐ নীলাভ ধূসর অভ্রভেদী ভূধর শ্রেণীর শোভাময় ঐ দৈব দৃশ্যের প্রভাবে সকল দুঃখই শেষে আনন্দেই পরিসমাপ্তি লাভ করিবে। সত্যই অহংকৃত মত্ততায় মহান্ এই দৈব দৃশ্যের মহিমা নিজ ভাষায় বর্ণনা করিতে যতই চেষ্টা করিনা কেন, আমার সকল আয়াস বিকল হইতে বাধ্য। যেহেতু প্রত্যক্ষ দর্শনেও সে বস্তুর মহিমা সম্যক অবধারিত হইবার নয়, আমাদের মত দুঃস্থ ক্লিষ্ট জীবন সংস্কৃতির দম্ভে দাম্ভিক, দেহ সর্ব্বস্ব নাগরীক কেমন করিয়া সে বিষয় বর্ণনায় বুঝাইতে সক্ষম হইবে? সে জন্য সে দিকে চেষ্টা না করিয়া পথের কথাটুকুই বলিব,—কেমন করিয়া ভৈরব ঘাটি উত্তীর্ণ হইয়া আমরা গঙ্গোত্তরী পৌঁছিয়াছিলাম।

খাড়া চড়াই পথে অনেক কিছু আছে। যতক্ষণ না আমরা ঐ ভৈরব পর্ব্বতের শিখর দেশে পৌঁছিলাম ততক্ষণ চলিতে চলিতে তীব্র বেগবতী ঝরনা, বড় বড় গুহা পাইলাম, নানা বর্ণের পাথর স্তূপ, সুন্দর সুন্দর গাছ, এমন-যাহা পূর্ব্বে দেখি নাই, তাহা দেখিতে পাইলাম। অতটা উঁচু পর্ব্বতের উপর কি বিদ্যুৎ গতি জলপ্রবাহ। ঐখানে মাটির রং লাল, তাহাতে আমার এই ধারণা হইল ভৈরব পর্ব্বতের উপরাংশে অনেকটা স্থান গৈরীক ময়, নির্ঝরিণীও গৈরিকভূমি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছে মনে হইল। এতাবৎ প্রায় হিমা-লয়ের উচ্চতম প্রদেশগুলিতে ঝরনার জল সর্বত্রই মিষ্ট, কিন্তু এই ভৈঁরো পাহাড়েই তাহার ব্যতিক্রম লক্ষ্য করিলাম। তৃষ্ণার্ত্ত পথিক, পান করিতে গেলাম, মোটেই তৃপ্তিকর নয়, এমন বিসাদ জল কোথায়ও পাই নাই। অনেকগুলি বাঁক, এই পর্ব্বতের পাদমূল হইতে ক্রমান্বয়ে এই চড়াইটিকে সম্পূর্ণ করিয়াছে। শেষ দিকে, অনেক গুহা যেথায় অনেক সাধু স্থায়ী ভাবে বাস করেন দেখা গেল। অবশ্য এই পর্ব্বতের আরও উপরের দিকে গঙ্গোত্তরী পার হইয়াও গুহাবাসী সাধু বা সাধক দেখিয়াছিলাম, সেটা গোমুখের পথে।

এখন পর্ব্বতশীর্ষে উঠিতে দুই এক খানি ঘর দেখা গেল,—ক্রমে ভৈরব মন্দিরও নয়ন গোচর হইল। শিখর দেশে রৌদ্র ঝলমল করিতেছে বেশ প্রশস্ত স্থান অনেকটা, তাহার মধ্যেই গ্রাম খানি। গ্রাম অর্থেই তীর্থ সংক্রান্ত যা কিছু;—চটি, দোকান যাত্রী নিবাস, ধর্ম্মশালা। অবশ্য বাবা কালী কমলিবালার ধর্ম্মশালা ব্যতীত আর কোন ধর্ম্ম-শালা এখানে নাই। কাঠ ও পাথর ছাড়া আর কোন বস্তু দিয়া এখানে ঘর হয় না। কোন কোন ঘর একেবারেই কাঠের, এমন কি ছাদ পর্য্যন্ত;—কিন্তু সাধারণতঃ কাঠের মকান মজবুদ করিয়া প্রায়ই পাৎলা পাথর—টালির ছাদই বেশী। মন্দিরও তাই।

ভৈরব-ঘাটির পথের কথাতো হইয়া গেল, এখন পর্ব্বত শীর্ষে উঠিয়া দেখিলাম বেশ কতকটা প্রায় সমতল ভূমি যেন আমাদের আরাধ্য এই হিমালয়স্থ ভৈরবের গৃহস্থালীর আঙিনা। সেই প্রাঙ্গণ ভূমির চারিদিকেই মহান শরীর দেওদার, দুই একটি নয়, চারি দিকেই কুঞ্জবনের মতই সমুদয় ক্ষেত্রটি বেষ্টন করিয়া তোমায় আকর্ষণ করিতেছে। সে

রূপ নিম্ন হিমালয় পর্য্যটনকারীদের ধারণায় আসিবেনা। সে রূপ, বর্ণ ও আকৃতি মনকে উদাস করে। গিরিরাজের একদিকে পাথরের একটি ছোট্ট মন্দির,কাছাকাছিই যাত্রীনিবাস বা চটি রহিয়াছে। দোকানও আছে নীচের তলায় কিন্তু আমরা আজ এখানে আসিয়া জনমানবের চিহ্ন দেখিলাম না। এ নির্জ্জনতা বড় ভয়ঙ্কর। অবশ্য সব সময়েই এমন নির্জ্জন থাকে না। কিন্তু যে নির্জ্জনতা আমরা পৌছিয়া উপভোগ করিলাম উহার মধ্যে পড়িলে এ দেশের যে কোন নগরবাসী ভয় পাইবেন। কয়েকখানি দ্বিতল, ত্রিতল-গৃহ বাবা কমলিবালার ধর্ম্মশালা, ভৈরব, মন্দির, সবই আছে কেবল মানুষ নাই। এখানে বেশীক্ষণ থাকিবার প্রয়োজন নাই কেবল একটু বিশ্রামের জন্যই অবস্থান। তখনও যে আমার বাহক সাথী আসিয়া পৌছাইতে পারে নাই, তাহাতে আমি মনে মনে স্থির করিলাম যদি আমি চলিয়া যাই তাহা হইলে সেও এখানে নিশ্চয়ই দীর্ঘ কাল অপেক্ষা না করিয়া গাঙ্গীর পথেই আমার পিছনে চলিয়া আসিবে, আমি কিছু আগেই গাঙ্গীতে পৌছিব,—এই সঙ্কল্প করিয়াই আমি উঠিলাম। দেওদার কুঞ্জ অতিক্রম করিয়া যাইতে মনে মনে,—ফিরিবার পথে আসিয়া দীর্ঘ কাল এখানে বাস করিব এই কথাই মনে ছিল।

এবার যে পথ পাইলাম তাহার বৈশিষ্ট্য আমাদের মত পথিকের পক্ষে পীড়া দায়ক। এ ভাবের বিশৃঙ্খল প্রস্তর সমাকুল পথ এ পর্য্যন্ত এ দিকে পাই নাই।

পথটা প্রায় সাড়ে ছয় মাইল, গিরিসংকটের মত সব টুকুই চড়াই তবে অতি অল্প উৎরাইয়ের সঙ্গে মিলিত চড়াই, সুতরাং হিসাব করিলে বুঝা যাইবে যে আসলে সমস্ত পথটাই চড়াই। গঙ্গোত্রীর পথের আকর্ষণ ঐ দেওদার কুঞ্জ, ইংরাজীতে যাকে সিডার বলে সেই ধরণের গাছই বেশী। এ অঞ্চলের এই শ্রেণীর গাছকেও ভারতে দেওদারই বলে। ইহার কাণ্ডগুলি বেশ মোটা এবং অঙ্গ মসৃণ পাইনের সঙ্গে তুলনা করিলে এটি অতীব পরিষ্কার বুঝা যায়। আবার কোথাও কোথাও ঝাউ, যে গুলিকে ফার্ বলে তাহাও আছে আবার কোথাও কোথাও উইলোও আছে। তবে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ঐ দেওদারই দেখিয়াছি। মুসুরীতে যেমন ওক্, যাকে স্থানীয় ভাষায় বাঞ্জ্ বলে, প্রচুর দেখিয়াছি, ধরাসু পার হইবার পর আর উহার চিহ্নই দেখি নাই। আলমোড়ায় সেই রূপ পাইনের ছড়াছড়ি। ঐ জেলাটি পাইনে ভরা। কিন্তু গঙ্গোত্তরীর পথে ঐ পাইনের সঙ্গে পরিচয় কমই ঘটিয়াছে এ অঞ্চলে উত্তর কাশীর সঙ্গে সঙ্গে এই শ্রেণীর বিশাল বাহু দেওদারই ছড়াইয়া আছে চারিদিকে দেখা যায়। ইহারই বিশিষ্ট নাম হিমালয়ান দেওদার যাহা বৃক্ষমূল হইতে প্রসারিত বাহু এবং পত্রগুচ্ছে ভরা। দার্জ্জিলিং অঞ্চলে আবার অন্য প্রকার গাছ যাহা দেওদারও নয় পাইনও নয়, উপর দিক ভারি ঘন পত্রগুচ্ছ, ঠাসাঠাসি পাইনের মতই অথচ পাইন নয়। ইহাদের বোঁটাটি স্থূল তাহার রূপও কম নয়। তাই এই বিশাল হিমালয়ের বিভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় বৃক্ষের বাহুল্যই আমরা দেখিতে

পাই। কাশ্মীর হইতে পাইন আরম্ভ, সেই পাইন বরাবর হিমালয়ের পূর্ব্ব প্রান্ত পর্য্যন্ত আছে সত্য কিন্তু ইতিমধ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে নানা জাতীয় পার্ব্বত্য মহিরুহ বিশেষ রাজত্ব করিতেছে ইহাই দেখা যায়। তারপর,-অন্যান্য ভেষজ যে কত প্রকারের আছে হিমালয় রাজ্যে তাহার সংখ্যা করিবে কে? এখন যাহা বলিতেছিলাম,—
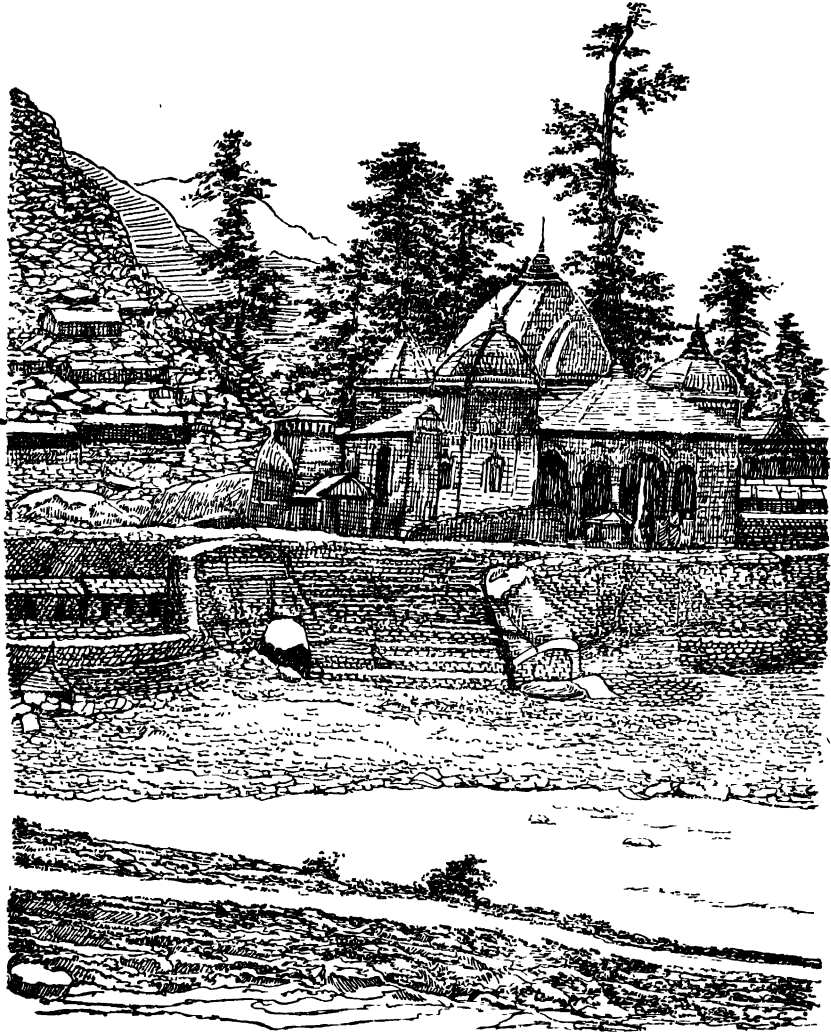
এই সাড়ে ছয় মাইল পথ, ভৈরবঘাটি হইতে কখনও ভাগীরথী বা গঙ্গাকে দক্ষিণে কখনও বামে রাখিয়া বরাবর গঙ্গোত্তরী মন্দির পর্য্যন্ত গিয়াছে;—আমরা বেলা তিনটা

নাগাদ গঙ্গোত্তরীতে পৌছিয়া গেলাম। ভৈরবঘাটিতে প্রায় আধ ঘণ্টা কাটাইয়া ছিলাম। চারিদিকেই পর্ব্বতমালা আর দেওদার বৃক্ষ পরিপূর্ণ জঙ্গল, সে জঙ্গলে নানা প্রকার ফুল গাছও কম নয়। কত স্থানে বরফে সাদা হইয়া আছে অবশ্য উহা সম্মুখে বা পার্শ্বস্থ পর্ব্বতের উপরেই দেখিয়াছি, এতটা নীচে আমাদের পথে পড়ে নাই। গঙ্গোত্তরী মন্দির গঙ্গার উপরেই,—আর মন্দির সংলগ্ন স্থান যেন একটি উদ্যানের মতই চারিদিক রম্য। নীচে নামিবার জন্য অনেকগুলি ধাপ আছে, মন্দির প্রাঙ্গণ হইতে সেই সিঁড়ি দিয়াই ভাগিরথীর স্রোত স্পর্শ করিতে হয়। নদী গর্ভে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড ছড়ানো ওগুলি স্রোতের বেগে পাহাড় ভাঙ্গিয়া গড়াইতে গড়াইতে আসিয়া পড়িয়াছে। স্রোতের ওপারে ঐ যে পর্ব্বত শ্রেণী তাহার মধ্যেও ঐ দেবদারু মিলিত উদ্যান, বিশাল-কায় প্রস্তর খণ্ড সমাকুল, তীর ভূমি হইতে উপরে উঠিয়া গিয়াছে। ঐ জঙ্গল, উপর দিকেই ঘন, নিম্ন ভাগ বিরল বৃক্ষলতা, নগ্ন পাষাণ খণ্ডের উপর দিয়া, কোথাও পাশ দিয়া উঠিয়াছে। নীচে ভাগীরথী দুর্দ্দমনীয় বেগে ছুটিয়াছেন, জলে পা রাখিয়া দাঁড়াইবার যো নাই। জল গভীর নয় ততটা, তবে শান্তিতে অবগাহন স্নানের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না।

মন্দিরাভ্যন্তরে কয়েকটি নারী বা দেবী মূর্ত্তি বিরাজমানা। তার মধ্যে গঙ্গা আছেন, যমুনা ও সরস্বতী এই তিনটি প্রধানা, তাহার মধ্যে মকর বাহিনী ভাগীরথীর মূর্ত্তি মধ্যস্থলে শোভা পাইতেছে, ভগীরথও আছেন জোড় হাতে দাঁড়াইয়া। এই গঙ্গোত্তরী প্রাঙ্গণে আসিয়া একথা মনে হইলনা যে এইখানেই গঙ্গার উৎপত্তি। আমার ধারণা গঙ্গার উৎপত্তি মাত্র একটি ধারায় হয় নাই। আরও উপর দিকে অনেকগুলি ধারা একত্র হইয়াই এই ভাগীরথীর উৎপত্তি হইয়াছে। এখান হইতে প্রায় আঠারো মাইল উত্তরে গোমুখ, শুনিয়াছিলাম; তাহার উপরে গাঙ্গোত্রী-তুষার-ভূমি অবস্থিত। সেই গ্লেশিয়ার উত্তীর্ণ হইয়া সে তুষার পর্ব্বত উহারই একাংশেই গঙ্গার উৎপত্তি ধরা হয়। অবশ্য এটা ইউরোপীয় পর্য্যটকগণের হিসাব;—কেহ কেহ ঐ স্থানে গিয়াছিলেন। তাঁহারা কেহ কেহ বলেন যে ঐ গ্লেশিয়ার প্রান্তস্থ যে তুষার পর্ব্বতেব সর্ব্বোচ্চ শিখর ঐ স্থান হইতে গলিত তুষার ক্রমে নীচে আসিয়া গ্লেশিয়ার বা তুষার ক্ষেত্রের তলে তলে প্রবাহিনীর সৃষ্টি করিয়াছে এবং উপরস্থিত স্থূল তুষার সমষ্টির তলে তলে বহুদূর আসিয়া বর্ত্তমান গোমুখ হইতে বাহিরে আসিয়াছে,—সুতরাং অদৃশ্য গঙ্গা যেখানেই থাক যেখান হইতে আমাদের চক্ষু গোচর হইয়াছে উহাকেই আমরা গোমুখ বলিব। অবশ্য এতটা নীচে এই গঙ্গোত্তরীতে দাঁড়াইয়া, যাহা দশ হইতে সাড়ে দশ হাজার ফিটের বেশী হইবে না, সেখান হইতে গোমুখের কথা অবান্তর তাই, এই গঙ্গোত্তরীতে পৌছানই গঙ্গোত্তরী তীর্থের শেষ বলিতে হইবে। চুড়িদার পাজামা গায়ে চাপকান ও চাদর মাথায় পাগড়ি পাণ্ডাও পূজরীর মাথায় টুপীপরা মূর্ত্তি আমাদের চক্ষে বিষম লাগে। যাত্রীদের

জন্য কালী কমলীওয়ালার ধর্ম্মশালা তো আছেই তা ছাড়া সদাব্রতের ব্যবস্থাও আছে, সাধু সন্ন্যাসীর জন্য কোন কোন রাজা, নানা শ্রেণীর বনিক ব্যবসায়ী ধার্ম্মিকগণের দানে পুষ্ট প্রতিষ্ঠানে যেমন জয়পুর মহারাজের ক্ষেত্র, পাঞ্জাব সিন্ধু প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি ক্ষেত্রে যথেষ্ট ব্যবস্থাই আছে। অন্ততঃ ছিল সেই সময়, সকল শ্রেণীর পর্য্যটকের ব্যবস্থা ; যখন আমি গিয়াছিলাম। এখনও ডাক বাঙ্গলা তো আছেই, তা ছাড়া আরও উন্নতি হইয়াছে নানা দিকে, বলা যায়। গত তেত্রিশ বছর পূর্ব্বে যাহা ছিল তাহাপেক্ষা এখন আরও ধর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে নিশ্চয়ই পথেরও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। আশা করিতে পারি যে, সে দিন আর বড় বেশী দূরে নয়, যখন বিমানের ঘাটি এখানে ভারতের সর্ব্ব প্রদেশ হইতেই তীর্থকামী যাত্রীবর্গ লইয়া এই গঙ্গোত্তরীতে অবতীর্ণ হইবে। গঙ্গোত্তরী পর্য্যন্ত আসিয়া সাধারণ যাত্রী তীর্থ শেষ করেন। তীর্থকামী তথা পুণ্য লোভী নরনারী আমাদের এই ভারতে অসাধারণ অধ্যবসায় দেখাইয়া থাকেন যখনই কোন পুণ্যের ব্যাপারে যোগাযোগ ঘটে। আমাদের সাহিত্যে বিশেষতঃ গঙ্গার অবতরণ লইয়া যে পৌরাণিক কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার মধ্যে প্রবেশ করা দুরূহ। ধরুন সুরলোক হইতে সুরধুনি যখন প্রথম এই পুণ্য ভারতের তুষার ভূমিতে অবতীর্ণ হইবেন উঁহার বেগ ধারণ তো সহজ বিষয় নয়, আর সেই বেগ ধারণ করিবেই বা কে ? একমাত্র শিবই আছেন যিনি পারেন ঐ বেগ ধারণ করিতে। শিবই ঐ বেগ ধারণ করিয়াছিলেন, তারপর ভগীরথ শঙ্খধ্বনী করিতে করিতে চলিলেন ভাগীরথীকে লইয়া হিমালয়ের নিভৃত প্রদেশ হইতে ক্রমে ক্রমে সমতল ভূমিতে,—তারপর নানা দেশের মধ্য দিয়া সমুদ্র অভিমুখে। এ কি অপূর্ব্ব ব্যাপার, মনে করুন, হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চস্তরে তুষার ক্ষেত্রে জন্ম, সেই বেগবতী ক্রমান্বয়ে নিম্নগতি ও বিস্তৃতির ধারা, কত কত অন্যান্য ধারা, অতটাই বেগশালিণী নির্ঝরিণী যুক্ত হইয়া ক্রমে প্রশস্ত ও প্রসারিত হইয়া সমতল দেশের পানে গতি, তারপর কত কত দেশ কত কত ভূমি প্লাবিত করিয়া আর্য্যাবর্ত্ত হইয়া বিহার তারপর বঙ্গদেশের কতোগুলি শাখা প্রশাখাকে পুষ্ট করিয়া পদ্মায় পরিণতি, তারপর সাগরে প্রবেশ। কি বিরাট সৃষ্টি, কি বিশাল বেগ, প্রবাহের কি অসাধারণ বিস্তার। এই ভাবে দেখিলে আমরা কতকটা অন্ততঃ বুঝিতে পারি যে ঐ হিমাচলের হিম, জল হইয়া কি অপূর্ব্ব বেগ সঞ্চয় করিয়া আপন পথে কায়া বিস্তার করিতে করিতে নীম্নগামী হইয়া পর্ব্বত পাদমূল হইতে সারা উত্তর পথ প্লাবিত করিয়া প্রত্যেক ভূমির সর্ব্বার্থ সিদ্ধ করিয়া সাগরে গিয়া আপনাকে লোপ করিয়া দিয়াছে।

এক

গঙ্গোত্তরী হইতে গোমুখ, ঠিক কতটা পথ তাহা অনুমান ব্যতীত যথার্থ নির্দ্ধারণের উপায় মাই ; কারণ, কোন নির্দ্দিষ্ট পথই নাই তো মাইলের নিদর্শন থাকিবে কেমন করিয়া? সরকারী জরীপ অথবা সার্ভে ম্যাপের সঙ্গে সাধারণ তীর্থযাত্রীদের সম্বন্ধ অল্প, কাজেই অনেক সময় পাণ্ডাদের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিতে হয়। গোমুখ এখান হইতে পূর্ব্বদক্ষিণ কোনে অবস্থিত আঠারো মাইল, অতীব বন্ধুর পথ—এই পর্য্যন্তই শুনিয়াছিলাম। সাধারণ যাত্রী, যারা এই পুণ্যভূমিতে কষ্টে স্বষ্টে একবার আসিয়াছে, গঙ্গোত্রী আসিবার পর পাণ্ডাদের মুখে পথের বিবরণ শুনিয়া গোমুখ যাইতে তাহাদের আর উৎসাহ থাকিবে না। পথের সবটাই গ্রেট হিমালয়ান রেঞ্জের মধ্যেই।

কাজেই এখানকার তীর্থগুরু পাণ্ডাদের পক্ষে যাত্রী লালন-পালনের কারবার ভাগীরথীর তীরে মন্দির, ধর্ম্মশালা, ডাকবাঙ্গলা, যাত্রীনিবাস শোভিত এই গঙ্গোত্রী গ্রামখানি পর্য্যন্তই ভাল চলে। যে যে কারণে গোমুখের পথে যাইতে তাহাদের কাছে বিশেষ উৎসাহ পাওয়া যায় না তাহার মধ্যে বিশেষ কারণ হইল শীত, তুষারপাত, আশ্রয়-হীনতা ও দুর্গমতাই প্রবল। পৌরাণিক বার্ত্তা, কতকগুলি স্থান দেখাইয়া যথা,—এইখানেই ভগীরথ ত্রেতাযুগে কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন, এইখানেই তিনি বর লাভ করিয়া সাগর বংশ উদ্ধারের জন্য গঙ্গাকে পথ দেখাইয়া আগে আগে শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে যাত্রা করিয়াছিলেন,—এই সকল পুরাণেতিহাসের কথায় পাণ্ডারা স্থান-মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া যথাসম্ভব শীঘ্রগতি প্রত্যাবর্ত্তনের পরামর্শ দিয়াই তাহাদের তীর্থ-গুরুর কর্ত্তব্য শেষ করে। যাঁহাদের সঙ্গে পুরাণের পরিচয় আছে, এতটা উৎসাহপূর্ণ প্রাণে সশরীরে একবার এখানে আসিয়া দাঁড়াইলে পাণ্ডাদের কাহারও মু'খর কোন কথা শুনিবার প্রয়োজন হয় না। প্রগাঢ় ভাবরসে শুষ্ক প্রাণকেও স্বতঃই সিক্ত করিয়া দেয় এখানকার চারিদিকের দৃশ্যসমূহ। বিশালকায় দেবদারুকুঞ্জ সমাকুল হিমালয়ের এই অংশ আমাদের মত সমতল নগরবাসী সাধারণের মনের উপর বিস্ময়কর প্রভাব বিস্তার করে। এমনই একটা মাদকতা আছে ইহার মধ্যে যাহার জন্য এতটা দীর্ঘ পথশ্রমের কষ্ট মনে স্থানই পায় না। একেতো এই গঙ্গোত্রী পথের যাত্রিসংখ্যা কেদার-বদরীনারায়ণের পথের তুলনায় অনেক কম, তাহার

উপর তীর্থগুরুগণের নিরুৎসাহের বাণী সত্ত্বেও গোমুখের পথে সাহস করিয়া যাহারা যায় তাহারা অসাধারণ এবং মহৎ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, অন্ততঃ শ্রমসহিষ্ণুতা ও সাহসের

পরিচয়ে। অতএব একথা সত্য যে, যাহারা যাইবার তাহারা ঠিকই যায়, পথের দুর্গমতার কথায়, কোন প্রকার নিরুৎসাহের বাণীতে তাহাদের অন্তরের উদ্দীপনা ক্ষীণ হয় না; বরং একটা কৌতূহলী যুবকপ্রাণ দীপ্ত হইয়া উঠে পথের দুর্গমতার কথায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার বাহক তো আমায় এখানে পৌঁছাইয়া উত্তরকাশী চলিয়া গিয়াছে। একজন যাত্রী

তাহাকে পাইয়া অধিক অর্থ সাহায্যে বশীভূত করিয়া লইয়া গিয়াছে, কাজেই এখন আমি একলা পথ ঠিক করিয়া যাইতে পারিব কি ? ইহাই ছিল ভাবনা।

কত ভাবেই ভাবিতেছিলাম পথের কথা। এখান হইতে পথ কোথায় এবং কেমন করিয়া পথের সন্ধান করিব ? কিন্তু পথ তো পড়িয়াই আছে, যে অনুসন্ধান করিবে সে-ই পাইবে। অনুসন্ধান করিয়া পথ পাই নাই এতটা জীবনে এমন তো কখনই ঘটে নাই। তা'ছাড়া সহজ পথ তো জানাই আছে। প্রাচীন কাল হইতেই এই হিমালয়ে সকল পর্য্যটকই ভাগীরথী প্রবাহিণীকে ধরিয়াই পথ করিয়া লইয়াছে। তখনও যেন ক্ষিপ্রগতি নদীর ধারা লইয়াই এখানকার সর্ব্বত্র পথ সকল নির্দ্দিষ্ট ছিল এখনও তাই—এই ভাগীরথীর ধারা ধরিয়াই পথ আবিষ্কার করিতে করিতে গন্তব্যস্থলে পৌছাইতে হইবে। তবে এ পথে কোথাও লোকালয় নাই। নাইবা রহিল, আমি তো ভিক্ষোপজীবী নই, খাদ্য সঙ্গে লইব ও গুহায় থাকিব। সঙ্গে কেহ না যদি থাকে তো নিঃসঙ্গ একাই যাইব। একলা পথে ধ্যান জমে ভাল। একলাই যাইতে সঙ্কল্প করিলাম।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত একলা যাইতে হইল না। বিধাতার নির্ব্বন্ধ; বৈকালে ডাক-বাঙ্গলায় গিয়াছি, ওখানেই আড্ডা জানিতাম। একজন বাহক যদি পাওয়া যায়,—কারণ মাল পত্র কম্বলাদি যাহা কিছু সম্বল, তাহার উপর আরও কিছু খাদ্যদ্রব্যও লইতে হইবে। সুতরাং আমার সঞ্চিত অর্থে সঙ্কুলান হয়, এমনই যদি বাহক কাহাকেও পাওয়া যায় তাহার সন্ধানেই ফিরিতেছিলাম। গাড়োয়ালী একজনকে বারো টাকায় ঠিক করিয়া দিল ডাকবাঙ্গলার জমাদার বিষণরাম। যে বাহক পাইলাম তাহার নাম নর-নারায়ণ; প্রায় প্রৌঢ় বয়স্ক এই হৃষ্টপুষ্ট, সবল, খর্ব্বাকৃতি শ্রমজীবী আমার পথ-প্রদর্শক, বাহক, সঙ্গী সব কিছুই, পথের একমাত্র সহায়। চমৎকার মানুষ, এ সংসারে তাহার কেহই নাই। মাতাপিতা, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা এক সময় সবই তার ছিল, এখন কেহই নাই, সবাই, গুজর গেয়া। তাহার সুখের সংসার-হাট ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাই সে একলা। ইহাতে দুঃখ নাই, তাহার মধ্যে প্রবল একটি সান্ত্বনা আছে। সে বলে, যাহার জিনিষ সেই লইয়াছে আমার দুঃখ করিবার কি আছে ? আমি বলিলাম, ঠিক, যদি সবাই আমরা কথাটা এমন সরলভাবে বুঝিতাম !

ঘর ছাড়িলে সবাই আপন; নর-নারায়ণ আমায় সব কিছু শুনাইয়া দিল। এখন যাত্রার আসল কথাগুলি এই যে, কিছু চাল, ডাল, আটা, ঘি, নূন, গুড়, খাদ্য যাহা কিছু প্রয়োজন সঙ্গে লওয়া চাই,—পথে লোকালয় নাই। গঙ্গা হইতে দূরে পড়িলে, পানীয় জলও পাওয়া যাইবে না, তবে সেটা এক জায়গায় মাত্র। তৃতীয় দিনে পৌছাইয়া আবার ঐ দিনই ফিরিতে হইবে, থাকিবার স্থান নাই। বরফের উপর দিয়া যাইতে হইবে; কারণ, ও-অঞ্চল সবটাই তুষার-রাজ্য। পায়ে জুতা না হইলে চলিবে না। বন্ধু আমার,—

জুতা মোজা আছে কিনা জানিয়া লইল। পট্টি এবং আরও এক জোড়া দড়ির জুতা চাই, উহা আমার ছিল। আমি তাহাকে বুঝাইয়া দিলাম যে, যমুনোত্রী হইয়া আসিতেছি, সুতরাং কতকটা অভিজ্ঞতা আছে। পথ দুর্গম হোক তাহাতে ভয় নাই, চলিবার মতো স্থান পাইলেই উত্তীর্ণ হওয়া যাইবে। তবে আমি বিশেষ ভাবেই জিজ্ঞাসা করিলাম যে, ঐদিনই ফিরিতে হইবে কেন? অমন পবিত্র স্থানে দুই চারিদিন থাকিতে পাইব না? উত্তরে সে বুঝাইয়া দিল, ওখানে থাকিবার স্থান নাই, কেহ থাকে না। ঐ তুষার-রাজ্যে রাত্রে যে ঠাণ্ডা পড়ে মনুষ্য-শরীর তাহা সহ্য করিতে পারে না। সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল আপত্তি হইল এই যে, ও-সকল প্রত্যক্ষ দেবস্থান, স্বার্থকামী, লোভী, ভোগাসক্ত মানুষ নরক সঙ্গে লইয়া যাইবে। ওখানে থাকিতে গেলে স্থানের পবিত্রতা নষ্ট হয়, তাহাতেই দেবতার কোপে পড়িয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত বরণ করিতে হয়। মানুষ যেখানে যাইবে নরক সৃষ্টি করিবে এতো জানা কথা। যোগী ব্যতীত ওখানে থাকিতে পারে না, এ কথা সত্য। যাহা হউক, সকল কথাই বুঝিলাম। মানুষ যেখানে যায় সেখানে নরক সৃষ্টি করে—এ সত্য সভ্যতা-গর্ব্বিত দাম্ভিক লোক স্বীকার করিবে না। অথচ এ সত্য সভ্য-জগতের সর্ব্বত্রই কাজ করিতেছে। যাহা হউক, পথের উপযোগী সকল কিছুই সংগ্রহ করিয়া পর দিনই যাত্রার সঙ্কল্প করিলাম। এখন তার পথের কথা।

দুই

মন্দির অতিক্রম করিয়া কতকটা গেলে এক সরু পাকদণ্ডি পথ, ভাগীরথীকে দক্ষিণে রাখিয়া বরাবর কতকটা বামে পাহাড়ের উপর উঠিয়া গিয়াছে আমরা সেই পথে চলিলাম। ভাগীরথীর প্রবাহ যদিও ক্রমে দূরে, পাহাড়ের নীচে চলিয়া গিয়াছে কিন্তু বিচিত্র কল্লোল কানে আসিতেছে। যে পাহাড়ের গা দিয়া আমরা চলিয়াছি কখনো একটু চড়াই, কখনও সামান্য উৎরাই,কতকটা সোজা এই ভাবেই চলিয়াছে। সেখান হইতে আমাদের দক্ষিণে পর্ব্বতমালার মধ্যভাগে দেবদারুশ্রেণী এবং নানাপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচিত্র বর্ণের লতাগুল্মসমাকুল বনভূমি দেখা যাইতেছিল। আমাদের পথেও ঠিক ঐ ভাবের বিরল দেবদারু এবং লতাগুল্ম সকল চারিদিকেই রহিয়াছে। পার্থক্য কেবল যাহা দূরস্থ কাননের মধ্যে বর্ণের বৈচিত্র্য, নিকটে তাহা ভিন্ন বিভক্ত এবং নানা বর্ণের প্রস্তরখণ্ড সমাকুল বলিয়া কতকটা ধূসরের সমন্বয়ে চক্ষে ধরা দেয়। যে সকল প্রস্তরখণ্ড স্তূপাকারে পথের উপর পড়িয়া আছে, উহা নানা আকারের। তাহার উপর পা দিয়া চলাও যতটা অসুবিধাজনক আবার মধ্যে মধ্যে পথের উপর ন্যস্ত প্রকাণ্ড শরীর অত্যন্ত মসৃণাঙ্গ পাষানের উপর পা দিয়া অতিক্রম করাও ততটাই কষ্টকর। এ পথের সব কিছুই আলগা,— এমনই আলগা যে, পাদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গেই পাথরগুলি পায়ের চাপে চারিদিকে সরিয়া

যাইতেছে। সুতরাং প্রতি পদক্ষেপেই একটু বেশী শক্তি ব্যয় করিয়া চলিতে হইতেছে। চলায় সুখ নাই বরং বিরক্তিকর। একেতো পথ বলিয়া কিছুই নাই, পাকডাণ্ডিও নয়, তবে সন্মুখে লক্ষ্য করিয়া এই যে নানাবিধ গুল্মলতাজড়িত বিভিন্ন আকারের প্রস্তরসমাকুল বন্ধুর ক্ষেত্রের ফাঁকে ফাঁকে রেখা ধরিয়া চলিতেছি তাহাকেই পথ বলিতেছি। সেই পথে এমন এক এক খণ্ড বিশাল, মসৃণপৃষ্ঠ কুর্ম্মাকৃতি পাষাণ পড়িয়া আছে দেখিয়া মনে হয় যেন পথরোধ করিয়াই রহিয়াছে। সূর্য্যকিরণে তাহার উপর ভাগ চক চক করিতেছে। পৃষ্ঠদেশ তাহার এতই মসৃণ যে, খালি পা ব্যতীত চলিবার যো নাই। আমার তখন পা খালিই ছিল কিন্তু আমার বাহক-বন্ধু নর-নারায়ণের পায়ে গাড়োয়ালী সিপাইদের বুট। তাহাকেও বোঝা নামাইয়া উহা খুলিতে হইয়াছিল। কোন জুতা চলে না এমন স্থানে।

যাহা হউক, এই অংশে আমাদের পথের যে পরিস্থিতি তাহা যে একেবারেই জন-মানবের গতাগতি ও স্থিতি চিহ্নবর্জ্জিত, মনে করিবার কোন কারণ নাই। আমরা যেখান দিয়া চলিতেছি, তাহার মধ্যে কখনও কিছু উচ্চে কখনও পার্শ্বে অথবা কত নীচে ছোট বড় নানাভাবের প্রকৃতিরচিত গুহা দেখিতে পাইতেছি। কোন কোনটীতে তখনও কোন তাপস বাস করিতেছেন এমনও দেখিয়াছি। এইভাবে প্রায় দুই মাইলের অধিক চলিয়া ধীরে ধীরে নামিতে লাগিলাম। ক্রমে ভাগীরথীর তীরে আসিয়া পড়িলাম কতক্ষণ তীরে তীরেই চলিলাম।

এইভাবে আসিতে আসিতে এমনই একটি স্থানে আমরা আসিয়া পড়িলাম যেখানে জাহ্নবীর সৈকতভুমি হইতেই যেন পথের বাধা হইয়া দেয়ালের মতই খাড়া পাহাড় উঠিয়াছে। তাহার নীচের দিকটা প্রায় খাড়া এবং এমনই পিচ্ছিল যে, উহার উপর উঠা অসম্ভব। তারপর উপর দিকে বিচিত্র তরুলতা গুল্ম-ঘনসন্নিবিশিষ্ট বন জঙ্গলপূর্ণ, তাহার মধ্যে পথ আবিষ্কার করাই কঠিন। আমার একমাত্র সহায় নর-নারায়ণ তখনও পশ্চাতে। বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছি আর ভাগীরথী পার হইবার সহজ পন্থা আবিষ্কারের চেষ্টায় এদিক ওদিক সবদিক দেখিতেছি। এখানে গঙ্গা প্রায় ১৫।১৬ ফুট চওড়া হইবে।

গত রাত্রে পথের জন্য মোটা মোটা অনেকগুলি পর্য্যাপ্ত ঘৃতপক্ক পরোটা আমার বাহক বন্ধুর বিশেষ সাহায্যেই প্রস্তুত করিয়াছিলাম; তাহার একখানা পাতার ভিতর কিছু আমের আচারও একটি লাড্ডু বাঁধিয়া আজ যাত্রাকালে সঙ্গে ঝুলির মধ্যে লইয়াছিলাম। আর যা কিছু সবই নারায়ণের পৃষ্ঠে ভাল করিয়া কম্বলাদির সঙ্গে বাঁধা ছিল। এখন এই পবিত্র ভাগীরথী তীরে উহা বাহির করিলাম এবং অত্যন্ত চিন্তিত মনে চর্ব্বনে মগ্ন হইলাম। ইতিমধ্যে আমার বন্ধু পশ্চাতে আসিয়া কখন বোঝা রাখিয়াছে, লক্ষ্যই করি নাই।

দেখিতেছি যে, জাহ্নবীর জল হইতে আরম্ভ করিয়া তীরস্থ সকল উপলখণ্ড এই ক্রম উচ্চ পথ অবধি বিস্তৃত রহিয়াছে। নানা আকারের উজ্জ্বলমসৃণ নানাবর্ণের এই পাষাণখণ্ড দেখিতে সুন্দর, সৈকত-বালির উপর প্রায় একহাত স্থূল, ইহার উপর পা দিয়া চলা কি সুন্দর, শুধু পথে চলা নয়, চলিয়া জল পর্য্যন্ত পৌছানো। পৌছিয়া তারপর ওপারে যাইতে দুই আড়াই হাত লাফ দিয়া একখানি বিশালকায় কূর্ম্মপৃষ্ঠাকৃতি পাষাণের উপর উঠিতে হইবে। তারপর সেখান হইতে প্রায় সাড়ে পাঁচ কি ছয় ফুট ব্যবধানে আর একখানি পাষাণ রহিয়াছে, সেখানি উষ্ট্রপৃষ্ঠ, সুতরাং তাহার উপর দু'পা রাখিয়া দাঁড়াইবার প্রশস্ত স্থানের অভাব প্রচুর। তারপর ইহার কোনাকুনী কিছু দূরে, সেও প্রায় চার ফুট হইবে একখানি হস্তীপৃষ্ঠ পাষাণ আছে বটে, আর তাহাতে দু'পা পাতিয়া দাঁড়ানোও যায় বটে কিন্তু সেখান হইতে পরপারের দিকে যে শেষ পাষাণ খণ্ড তাহা সাড়ে পাঁচ বা ছয় হাত। এখন এই কূর্ম্মপৃষ্ঠ, উষ্ট্রপৃষ্ঠ ও গজপৃষ্ঠের ব্যবধানে যে ফেণায়িত স্রোত বা জলের গতিবেগ তা এমনই প্রখর যে ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগবান একখানা মেলট্রেণ যেন ইহার তুলনায় মালগাড়ী। অবশ্য আমার এইভাবের গতিবেগের ধারণা বা হিসাবকে অঙ্ক বিজ্ঞানবিদেরা নিশ্চয়ই সন্দেহের চক্ষে দেখিবেন এবং তাহাতে আমি মোটেই দুঃখিত হইব না। তবে কথাটা এই যে; দাঁড়াইয়া হোক বা বসিয়াই হোক জলের দিকে লক্ষ্য করিলে মাথা ঘুরিয়া যায়। এখন পারের উপায় কি? পশ্চাতে উপবিষ্ট নরনারায়ণ বন্ধুকে এখন লক্ষ্য করিলাম তাহার কাশির শব্দে। বলিলাম,—কৈসে পার হোনা জি? শুনিবামাত্রই নির্ভয়ে সে বলিল,—হো জায়গা, কুচ ফিকর নেহি, বলিয়া সেও কিছু জলযোগ করিল। শেষে, কয়েক গণ্ডূষ জল পান করিয়া শরীর স্নিগ্ধ হইলে আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—কি ভাবে পার হইবে বল শুনি এখন? শুনিয়া সে কিছুই না বলিয়া তাহার মোট পৃষ্ঠে লইল, অবশ্য তাহার পায়ের পটি, জুতা খুলিয়া সেই মোটের সঙ্গে আগেই ঝুলাইয়াছিল। এখন সে লাঠি হাতে ধীরপদে জলের দিকে চলিল। বলা বাহুল্য আমি তাহার অনুসরণ করিলাম বটে কিন্তু আমি যেভাবে নদী গর্ভস্থ পাথরের উপর দিয়া লাফাইয়া পার হইবার কল্পনা করিয়াছিলাম সে দিক দিয়াই গেল না। আরও খানিক উপর দিকে গিয়া ধীরে ধীরে লাঠিটা জলের মধ্যে ডুবাইয়া সে গভীরতা বুঝিয়া লইল। তারপর সেই স্রোতের মধ্যে বিপরীত মুখে চলিতে লাগিল। হাতের লাঠি প্রতি পদেই আগে যাইতেছে। এই ভাবে সে সেই স্রোতের মধ্যে কোনাকুনি পরপারের দিকে যাইতে লাগিল। মাঝখানে একখানি মাত্র বিশাল-কায় পাষাণ, তাহার সর্ব্বাংশই অতীব মসৃণ; কতকটা খয়েরা তারপর বেগুনী পরে মাটির রং, তলার দিকটা কালো। নানা রংএর বিচিত্র আকারের পাথর। প্রায় কোমর না হোক হাঁটুর উপরে কতকটা অবধি জলস্রোত নগ্ন শরীরে যাইয়া বন্ধু, পাষাণের

নিম্নস্তরের উপর উঠিল এবং উপর স্তরে তাহার বোঝা ঠেকাইয়া মাথার পটিটা বাঁ হাতে খুলিয়া দিল। সে এখন আমার পানে চাহিবার অবকাশ পাইল।

তারপর সে আমার দিকে দেখিয়া বুঝিল আমিও তৎপর আছি। আমি ছিলাম লম্বা। তাহার নিজের উরু জল যেথায়, আমার সেখানে হাঁটু পর্য্যন্ত। প্রায় বিঘা মাত্র তফাৎ। আমিও ঠিক তাহার পিছনে পিছনে যাইয়া উঠিলাম এবং তাহার পাশেই জলে পা রাখিয়া দাঁড়াইলাম। তখন সে আমায় বলিল যে, এইখানে পাথরের নীচে কোথাও কোথাও তাহার মাথা ছাড়াইয়া প্রায় এক বিঘৎ জল আছে। শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—তব কৈসে যাওগে? সে বলিল যে, পায়ের তলায় খুব কাছাকাছি উঁচু উঁচু পাথর আছে, লাঠি দিয়া উহা দেখিয়া বুঝিয়া পা বাড়াইতে হইবে। এই ভাবেই পার হইতে হইবে। পাথরের পর পাথর লাফাইয়া ওপারে যাইবার কল্পনা করিয়াছিলাম, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে আমার প্রদর্শকের নির্দ্দেশ অনুসারে যাইতে হইল সারা জলস্রোতকে প্রতিপদে স্বীকার করিয়া, অবশ্য পার হইতে হইল অনেকটা ঘুরিয়া ফিরিয়া।

মনে হয় ঐখানে স্রোত পার হইতে তিন পোয়া ঘণ্টারও অধিক লাগিল। এপারে আসিয়া নরনারায়ণ যাহা বলিল আমার ভাষায় তাহার ভাবার্থ এইরূপ:—উপরস্থ সাধু সন্ত এবং মহাপুরুষেরা এইখান দিয়াই যাতায়াত করেন আর তাঁদের আশীর্ব্বাদ আছে বলিয়াই আমরা এত সহজে এই প্রবল স্রোত পার হইতে পারিয়াছি। তারপর পথপার্শ্বে একটি অতীব মসৃণ প্রায় হাল্কা বেগুনী রংএর একত্র তিন খানা ঋজু পাষাণ স্তূপ দেখাইয়া নরনারায়ণ বলিল যে, এইটিই তাঁহাদের চিহ্নিত স্থান। সে আরও বলিল যে, নীচের সাহেব সুবা, আংরেজ লোক, দল বাধিয়া আসিলে বড় বড় গাছ কাটিয়া বহু পাহাড়ী লোক লাগাইয়া পুল তৈরী করিয়া তবে পার হইতে পারে; আমরা পাহাড়ীরা এইখানে হাঁটিয়াই পারাপার করি।

এ পারেও পথ ভাল নয়। রাস্তা বলিয়া তো কিছু নাই—পূর্ব্বেই বলিয়াছি। যত্নে প্রস্তুত সরকারী সড়ক বলিতে যাহা বুঝায় তাহার অস্তিত্ব গঙ্গোত্তরীর মন্দিরে আসিয়াই শেষ হইয়া গিয়াছে। পথ চলার সুখও ঐ সঙ্গেই শেষ হইয়াছে। সত্য কথা, এপথে চলিয়া সুখ নাই। তারপর গঙ্গামায়ীর ধারা লক্ষ্য করিয়াই আলগা, ক্ষুদ্র, বৃহৎ নানা আকৃতিবিশিষ্ট বিবিধ বর্ণ সারা পথটাই একই প্রকার স্তূপের ওপর দিয়া কতক্ষণ এপারের কতক্ষণ ওপারের পর্ব্বতভূমি আশ্রয় করিয়া চলা। বড় বড় গাছপালাও ক্রমে বিরল হইয়া আসিতেছে,—অবশ্য দেবদারু মধ্যে মধ্যে দেখা যাইতেছিল বটে তবে অন্যান্য কোন বড় গাছ চক্ষে পড়ে না,—তবে লোহিত, পীত ও হরিতের মেশামিশি একশ্রেণীর ঘন লতাগুল্ম এপারে ওপারে দুদিকেই দেখা যাইতেছিল। ঐসব বিচিত্র বন লতাগুল্ম ঘন জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। উহাই দেখিতে দেখিতে পথের বন্ধুরতা অতিক্রম

করিতেছিলাম। এইভাবে প্রস্তর স্তূপের উপর দিয়া দীর্ঘ পথ, চড়াইও যত উৎরাইও ততই—নানাভাবে উত্তীর্ণ হইয়া অবশেষে এক বৃহৎ চড়াইয়ের মাথায় একটি প্রশস্ত এবং প্রায় সমতল ক্ষেত্রে আসিয়া পড়িলাম। এই স্থানটির মাধুর্য্যপূর্ণ দৃশ্যের গুরুত্ব যতই ঐ সৌন্দর্য্যের অন্তরালে যে অপর এক উপলক্ষ আছে তাহার গুরুত্ব ও কম নয়। তাহার প্রথম অভিব্যক্তি এই যে, স্থানটিতে পৌছিয়াই দেশ কাল জ্ঞান-শূন্য এক অনুভূতি অপূর্ব্বভাবে চিত্তকে সমাহিত করিয়া দেয়। এই ক্ষেত্র যে সেই গন্ধর্ব্ব-কিন্নর-যক্ষ-বিদ্যাধর প্রভৃতি উচ্চস্তরের অধিবাসিদের লীলাভূমি সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহই রহিল না।

এই সমতল ক্ষেত্রটুকু তিন দিকেই নানা প্রকার নাতিদীর্ঘ বৃক্ষ সকল,—এক দিকে ভুজ্জবৃক্ষের বন, রমণীয় স্থান যাহাকে বলে। গৌরবার্থে নয়, সত্য পরিচয়ার্থে, যাহার মধ্যে কল্পনা-রঞ্জিত মিথ্যা ব্যঞ্জনা নাই এই পুণ্য দেবভূমি তাহাই।

তিন

এখানে শীত অত্যন্ত প্রবল। মধ্যে মধ্যে বরফও জমিয়া রহিয়াছে দেখিলাম। সারাদিনে যাহা গলিবার তাহা গলিয়া গিয়াছে। এখন প্রায় বেলা ৩টা আন্দাজ হইবে। ঘড়ি তো সঙ্গে নাই, সূর্য্য দেখিয়াই বলিতেছি। মনে হইল, যদি প্রাতে আসিয়া এখানে দাঁড়াইতাম তাহা হইলে দেখিতাম সমস্ত ক্ষেত্র জমাট তুষারে আবৃত। কিন্তু তা সত্ত্বেও এস্থানের মাধুর্য্য বর্ণনাতীত। রবি কিরণে চারিদিকেই—পশ্চিম, উত্তর এবং পূর্ব্বদিকে তুষারমণ্ডিত শৃঙ্গধর, ঝলমল করিতেছে। আমরা কিছুক্ষণ এখানে ছিলাম। আরও কিছুক্ষণ থাকিবার ইচ্ছা ছিল। কিছুক্ষণের কথা বলিতেছি, সত্য সত্যই তখন মনে এই হইতেছিল যে, আজ অবশিষ্ট দিনটুকু এইখানে একটি পাথরের উপরে বসিয়া কাটাইতে পারিলে সুখী হইতাম। সঙ্গী বন্ধুটি কিন্তু নারাজ। বলিল যে, এটা দীর্ঘকাল বিশ্রামের স্থান নয়, আরও আগে যাইয়া উপযুক্ত স্থান পাওয়া যাইবে। কাজেই আমরা আবার চলিতে লাগিলাম।

যে ভুজ্জবনের কথা বলিয়াছি এখন ঐ বনের মধ্যে আমরা প্রবেশ করিলাম সেই অপূর্ব্ব প্রান্তর অতিক্রম করিয়া। এখানেও স্থানে স্থানে বরফ জমিয়া আছে, এখনও সব গলে নাই। আজ আরও কতকটা না গেলে কাল আমরা গোমুখীতে পৌছিতে পারিব না। সেইজন্য উহার মধ্যেই কতকটা সুখকর পথ পাইলে যতটা সম্ভব দ্রুত চলিয়া দৃশ্য উপভোগের সুখটা পোষাইয়া লইতাম। আমরা ভুজ্জ বৃক্ষ যাহাকে বলি, ইংরাজি নাম তাহার বার্চ। ইহার কাণ্ড উজ্জ্বল, মসৃন, দূর হইতে শ্বেত, কখনও ধূসর বর্ণ, আলোয় ঝক্‌ঝক্ করে। কি চমৎকার তার গায়ের মসৃণ ত্বক। উপরের খানিক ছুরি দিয়া কাটিলে পরতে পরতে পাৎলা কাগজের মত একের পর একটি

পর্ব্ব খুলিয়া লওয়া যায়। বাতাস লাগিলে উহার রং ক্রমে ক্রমে লাল হইয়া যায় এবং কিঞ্চিৎ শক্ত হয়। যাহা হউক অতঃপর ভূজ্জবন অতিক্রম করিয়া মাটিও পাথরপূর্ণ ঝোপ জঙ্গলময় কতকটা স্থানও পার হইয়া পুনরায় গঙ্গার নিকটস্থ হইলাম।

বোঝা নামাইয়া এইবার নরনারায়ণ আমার লোটা ও তাহার বড় লোটা—দুইটি লোটা লইয়া নীচে নদীগর্ভে নামিয়া গেল এবং অবিলম্বে দুই লোটা পূর্ণ জল লইয়া ফিরিল। তারপর বোঝা লইয়া এক হাতে লাঠি আর এক হাতে তাহার লোটা লইয়া চলিল। আমিও অপর লোটাটি ঝুলাইয়া তাহার পশ্চাৎবর্ত্তী হইলাম। বেলা তখন আন্দাজ চার কিম্বা পাঁচটা হইবে। আমরা অনেকটা উঠিয়া এক অতীব সুন্দর দেবদারু কুঞ্জের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। এখানে আসিয়া নরনারায়ণ পিঠের বোঝা রাখিয়া, আজ হিঁহাই রহনা পড়েগো, বলিয়া আবার চলিয়া গেল।

বুঝিতে পারিলাম না, এইখানে রাত্রি যাপন করিব কোথায় এবং কেমন করিয়া? আসিলে জিজ্ঞাসা করিব। ইতিমধ্যে সম্মুখস্থ পার্ব্বত্য দৃশ্য উপভোগে মগ্ন রহিলাম।

প্রায় আধঘণ্টা বসিয়াই আছি। অবশ্য এখানে বেশীক্ষণ ঠিক এক জায়গায় বসিয়া থাকিবার যো নাই। একবার মিনিট পাঁচ বসিয়া যেই শীতে হাত-পা জমিয়া যাইবার মত অবস্থা হইতেছে তখনই উঠিয়া বেড়াইয়া লইতেছি। কখনও বা কতকটা সামনের দিকেই অগ্রসর হইয়া বিচিত্র এই হিমালয়ের উচ্চস্তরের দৃশ্য উপভোগ করিতেছি। কতক কতক পূর্ব্বেও করিয়াছি, এখানে পেন্সিলের স্কেচ করিয়া কতকাংশ খাতায় আয়ত্ত করিলাম। এই ভাবে প্রায় আধঘণ্টা কাটাইলাম, তারপর দেখি আমার পরম সুহৃদ, মোটা-সরু নানা আকারের কাঠ সংগ্রহ করিয়া কাঁদে বোঝাই দিয়া দুই হাতে সামলাইয়া সহাস্য বদনে আসিতেছে। বোঝাটা লইয়া সে কাছে আসিল না,—ঐ যে কতক দূরে একটি উঁচু স্তূপের মত দেখা যাইতেছিল তাহার পাশে ফেলিয়া আমার দিকে আসিতে লাগিল।

জিজ্ঞাসা করিলাম, ব্যাপার কি? সে এবার তাহার পিঠের বোঝাটী অর্থাৎ যেটী বহন করাই তার প্রধান কার্য্য, তাহা আবার তুলিয়া লইল এবং আমায় বলিল, চলিয়ে। ব্যাস, আর কোন কথা নাই। যেখানে কাঠের বোঝা রাখিয়াছিল সেইখানে আসিয়া বাঁ দিকে ঘুরিয়া অনেকটা খাড়া যেন খুব পুরু প্রায় বারো হাত উঁচু দেওয়ালের মত, এমনই একটি পর্ব্বত-পার্শ্বস্থ শিলাস্তূপের সামনে তাহার বোঝা নামাইল। আমি নিকটে আসিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে সত্যই চমৎকৃত হইলাম। ঐ শিলাস্তূপের ঠিক পাশে একটি গুহা, সম্মুখে তাহার বাহিরের একাংশ। এই স্তূপটি দূর হইতে দেখিলেই মনে হয় এক খণ্ড বৃহৎ শিলা মাত্র। ঐ বিরাট শৈলস্তূপটি পালিশ করা আসবাবের মত; হাত রাখিলে পিছলাইয়া আসে এতই মসৃণ এবং নানা রংয়ের আভায় উজ্জ্বল ও বিচিত্র

রেখায় অলঙ্কৃত। এ পথে এমন বিচিত্র পাষাণের রূপ,—প্রকৃতির হাতে গড়া বিস্ময়কর রচনা আর দেখি নাই।

আমায় অবাক্ বিস্ময়ে মগ্ন দেখিয়া সে গুহার ভিতরে গেল। মাথা নীচু করিয়াই তাহাকে ঢুকিতে হইল। দেখিলাম, ভিতরে সে দাঁড়াইয়া চলা ফেরা করিতেছে। এই অপূর্ব্ব অপ্রত্যাশিত গুহাই আজ রাত্রে আমাদের আশ্রয়। কতকাল ধরিয়া কত শত সহস্র সাধুর আশ্রম অথবা পর্য্যটকের আশ্রয়স্থল এই বিচিত্র গুহাটি। কে জানে এমন আরও কত গুহা আছে যাহার কথা সাধারণ যাত্রীরা জানে না বটে কিন্তু খুঁজিলেই পাওয়া যায়,—এ সত্যটুকু বিশ্বাস করিতেই হয়। যাহাদের সঙ্গে ক্যাম্প নাই, লোক-বল নাই, অর্থবল নাই, গরীব, তাহারাও অবস্থাপন্ন ভ্রমণ-বিলাসীদের মত একই প্রকার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এমন কি সময় সময় অধিক সুখ স্বচ্ছন্দে এ অঞ্চলে ভ্রমণ করিতে পারে। নগরে বা গ্রামে তথা লোকালয়েই ধনৈশ্বর্য্যের কদর, ব্যবহার যা কিছু,—পর্ব্বতে বা জঙ্গলে উহার কোন মূল্যই নাই। ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া কে না বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়?

বন্ধু আমার কম্বলাদি ভিতরে লইয়া গেল এবং তাহার নিজের জন্য পাশে কতকটা স্থান রাখিয়া আমার জন্য শয্যা প্রস্তুত করিয়া তাহার উপর গায়ে দিবার লেপ ও কম্বল দু'খানি চাপা দিয়া বাহিরে আসিয়া আগুন জ্বালিল। গুহার দ্বারে আমি তখন বসিয়া তাহার কার্য্যকলাপ দেখিতে লাগিলাম।

ঝোলার ভিতর হইতে থালা ও আটা বাহির করিয়া পরিমিত জল মিলাইয়া সে আটা মাখিল, তারপর আজ রাত্রের এবং কাল প্রভাতের জন্য কয়েক খণ্ড রুটি পাকাইল। এই ভাবে আমাদের খাবার তৈয়ারী হইল এবং গরম গরম খাওয়া হইল। আর একটু করিয়া আমের আচার এবং লাড্ডু সংযোগে ক্ষুধা শান্তি হইলে জলপান করিয়া সন্ধ্যার পরেই শয্যা গ্রহণ করিলাম।

এই ভাবেই আমাদের কঠিন এবং বন্ধুর গোমুখের পথে প্রথম রাত্রি বেশ আরামে কাটিল। আগামীকালের পথ কি প্রকারের হইবে তাহা জানি না, যদি পথ ভাল হয় তাহা হইলে কালই গোমুখ দর্শন সম্ভব হইবে। শুনিয়াছিলাম গঙ্গার উৎপত্তি স্থানে গোমুখের দৃশ্য ঠিক যেন একটি গোমুখের আকৃতি, তাহার মুখবিবর হইতে জলধারা বাহির হইতেছে। এখন আমরা কি রকম দেখিব? কোথা হইতে আসিলাম, কোথা রহিয়াছি, কাল কোথা থাকিব ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

প্রাতে অর্থাৎ বেলা কত জানি না সূর্য্যোদয়ের কতক্ষণ পর আমি উঠিয়া দেখি বন্ধু বাহিরে আগুন জ্বালিয়া গুহা মুখে বসিয়া। একটি লোটায় গরম জল রাখা ছিল, দেখাইয়া দিল। তারপর মুখ ধোয়া হইলে চা পানের পর তল্পিতল্পা উঠাইয়া যাত্রা আরম্ভ হইল।

পথ অবশ্য আগের মতই, তবে কোথাও প্রস্তর খণ্ড মসৃণ আরও কোথাও অমসৃণ, তার সঙ্গে মাটিও আছে আর সেই মাটিতে নানা-জাতীয় লতা-গুল্ম ও পুষ্পগুচ্ছ। পরে,—পাহাড়ের গা দিয়া পথ কতক নামিয়া কতক উঠিয়া আবার জাহ্নবী তীরে আসিয়া পৌছিলাম। এপারে আর হাঁটিয়া যাইতে পথ নাই। আবার পার হইতে হইবে। তবে এবারে এক বিচিত্র অনায়াসলব্ধ সহায়তা, এই কারণে বিশেষ বেগ পাইতে হইল না। দুই দিকে কতকাংশ বাদ দিয়া মধ্যে দশ বারো হাত সেতুর মতই দুইটি বিশাল দেবদারু পাশাপাশি শুইয়া আছে। আমাদের পূর্ব্বে যাহারা আসিয়াছিল এ তাহাদেরই কাজ। বন্ধু বলিল, একদল সাহেব দু'এক হপ্তা পূর্ব্বে এ অঞ্চলে আসিয়াছিল। সম্ভবতঃ তাহারাই এই পুল করিয়া রাখিয়াছে। আমরা তাহাদের আশীর্ব্বাদ করিয়া স্রোতের প্রথমাংশ হাঁটিয়া মধ্যাংশ দেবদারু পুলের উপর দিয়া এবং শেষাংশ আবার হাঁটিয়া ভাগীরথীর অপর তীরে আসিলাম। এখানে তীব্র বেগের কথা আর কি বলিব? প্রবাদ বাক্য—কুটো দিলে দুটো হয়, এমনই স্রোতের উপর দিয়াই আমরা পার হইলাম। জল ছুটিতেছে কিম্বা ফুটিতেছে ফেনরাশি দেখিয়া কিছুই বুঝা যায় না।

চার

এবার আমরা গঙ্গাকে আমাদের দক্ষিণে রাখিয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছি। পূর্ব্ব মুখে চলিয়াছি, আবার কখনও পথ চলিয়াছে উত্তরে, আবার পশ্চিমে আবার কখনও বা উত্তর পূর্ব্ব দিকে। সেই পথের মধ্যে বিরল বৃক্ষলতা কতকটা যেন মালভূমির উপর দিয়া পথ। যদিও দুই পাশেই পর্ব্বতমালা যতটুকু দেখা যাইতেছে তাহাদের মধ্যে জঙ্গলও আছে আর মধ্য দেশে তুষারপাতের ফলে স্থানে স্থানে বেশ বরফ জমিয়া আছে। এপথে ও মধ্যে মধ্যে কতকটা তুষার ভূমির উপর দিয়া অস্বচ্ছন্দে চলিতে লাগিলাম। কোথাও উচ্চ ভূমির উপর প্রস্তর স্তূপসকল অতিক্রম করিয়া কখনও বা চিক্কণ শিলাখণ্ডের উপর অতি সাবধানে আরোহণ এবং অনুরূপ সাবধানে অবতরণ করিয়া প্রায় দুই ঘণ্টার উপর চলিয়া একস্থানে বিশ্রামার্থে বসিলাম। পর্ব্বতের এই স্তরে মাঝে মাঝে ভূর্জ্জবন প্রচুর। ইহার পরেই সর্ব্বোচ্চ হিমালয় স্তর, সে রাজ্যে কোন গাছপালা নাই। এই সকল গাছের মধ্যে যে ব্যবধান তাহাই আমাদের পথ। তাহারই মধ্যে একটু ফাঁকায় যেখানে রৌদ্র অব্যাহত, সূর্য্য দেবতার তাপ সবটুকুই পাওয়া যায় এমনই একস্থানে এক শিলাখণ্ডের উপর বসিয়াছি। বাহক তখনও কিছু দূরে ছিল তবে অল্পক্ষণেই সেও আসিয়া পৌছিল। উভয়েই এইখানে জলযোগের সঙ্কল্প করিলাম। জলযোগ করিতে করিতে নারায়ণকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আজ বৈকালের দিকে গোমুখ পৌছিতে পারিব তো? সংক্ষেপে সে বলিল যে, কাল সকালের দিকে হয়তো পারিব। আজ ভুজবাসা পর্য্যন্ত যাওয়া যাইবে, তার বেশী নয়।

ভুজবাসা কতদূর? জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, ইহাঁসে ছয় মিল হোগা। আশ্চর্য্য! গঙ্গোত্রী পর্য্যন্ত যে পথে আমরা আসিয়াছি, সে পথ হইলে ছয় সাত মাইল তো আড়াই-তিনঘণ্টার মধ্যেই অতিক্রম করিতে পারিতাম; হয়তো অবলীলাক্রমেই পারিতাম কিন্তু এ পথ বড়ই কষ্টকর। সারাদিনটাই লাগিবে বুঝিয়া আর কিছু না বলিয়া জলযোগ শেষ করিলাম, তারপর ধীরে ধীরে উঠিয়া পড়িলাম।

এই পর্ব্বতের মধ্য স্তর দিয়াই আমরা চলিতেছি। পাহাড়ের গা দিয়া কখনও দুই একটি দেবদারুর নীচে ঝোপ জঙ্গলের ভিতর দিয়া, কখনও বা ভুর্জ্জবনের মধ্য দিয়া পথ করিয়া চলিতেছি। এইভাবে চলিয়া আমরা বৈকালের দিকে ভুজবাসা নামক স্থানে আসিয়া পৌঁছিলাম। যথার্থ নামটি সার্থক করিয়া এখানে চারিদিকেই অসংখ্য ভুজগাছই বাসা বাঁধিয়াছে। তখনও চারিদিকেই বেশ রৌদ্র রহিয়াছে, তবে তাহার তেজ নাই।

এখানে আরও একটি আশ্চর্য্য বস্তু দেখিলাম। ভুজগাছ চারিদিকেই রহিয়াছে। আমি তাহার মধ্যে একস্থানে বসিয়া একটু বিশ্রাম করিতেছিলাম। বন্ধু নরনারায়ণ বোঝা রাখিয়া যেমন গতকাল গিয়াছিল তেমনি আজও গিয়াছে কাঠ বা জলের সন্ধানে। দেখিলাম কতকটা দূরে গাছের ফাঁকে ফাঁকে অপূর্ব্ব চাকচিক্যময় একটা পদার্থ দেখা যাইতেছে। দেখিয়াই যন্ত্রবৎ ধীরে ধীরে উঠিলাম; ঐ দিকেই লক্ষ্য করিয়া প্রায় দশ পা আন্দাজ গেলে পর উহা ম্লান হইয়া গেল, তখন আবার একটু দ্রুত চলিয়া কয়েকটি গাছ অতিক্রম করিবার পর খানিকটা প্রশস্ত,—প্রায় সমতল ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলাম। যেন মাপ-জোখ করিয়া প্রস্তুত ঐ ক্ষেত্রের মধ্যে অপূর্ব্ব বিশাল একটি সমচতুষ্কোণ নানাবর্ণের আভাযুক্ত প্রায় একহাত উঁচু প্রস্তর বেদী রহিয়াছে। আর্য্য হিন্দুগণের দৈবকর্ম্মে যে প্রকার বেদী ব্যবহৃত হয়, ইহা ঠিক সেই প্রকারই। কঠিন এবং চিক্কণ যেন একখণ্ড প্রস্তরে সম্পূর্ণ মানুষ নির্ম্মিত অতি পরিপাটি প্রশস্ত বেদী। ঐ বেদীর এককোণে একটি অপরূপ প্রস্তর-স্তূপ একটি ছোট মন্দিরের মত। তাহাও ঐ প্রকার বিচিত্র বর্ণাভায় উজ্জ্বল এবং মসৃণ। উপরিভাগে তাহার গায়ে সূর্য্যকিরণ পড়িয়া চক্‌চক্‌ করিতেছিল। এমনই বিচিত্র, নানাবর্ণে উজ্জ্বল, মসৃণ এই ধরণের শিলা-রূপ গতকল্য যেখানে ছিলাম সেই গুহা পার্শ্বে দেখিয়াছিলাম। সেইরূপই সব কেবল ইহার মধ্যে নীলাভ লোহিতের সমাবেশ। ইহার কতকাংশ পীতাভ নীল অপর অংশ নীল ও লোহিত, গৈরিকের আভাযুক্ত। শুধু তাহাই নয়, নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে দেখা যায় নানা ছন্দে উজ্জল রজতবর্ণের রেখাঙ্কিত; সর্ব্বাঙ্গেই চেরা পাইন কাঠের তক্তার গায়ে আঁশ যেমন হয় অবিকল সেইরূপ রেখালঙ্কারে পরিপূর্ণ স্তূপটি। আমি শীতের জড়তাযুক্ত তন্ময় অবস্থায় ছিলাম,—এমন সময়ে নরনারায়ণ ডাকিল, স্বামিজী! ফিরিয়া দেখি কতকটা

নীচে এই পাহাড়ের গায়েই একটা প্রশস্ত খাঁজ খানিকটা। তাহার উপর দাঁড়াইয়া সে ডাকিতেছে, আও, ইস্ গুফামে।

আমার পিছনেই পথের মতই কতকটা দেখিয়া সেইখান দিয়া তাহার নিকটে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, সম্মুখেই কতকটা উচ্চে অবস্থিত প্রায় দুই হাত উচ্চ এবং দেড়হাত চওড়া একটি দ্বারপথ, ভিতরে অন্ধকার, ঠিক তাহার নীচে কতক অপ্রশস্ত চত্বরের মত। সেই সবই যেন এক অখণ্ড প্রস্তরনির্ম্মিত। তাহারই দুইদিকে অর্দ্ধদগ্ধ দেবদারুর গুঁড়ি ও লম্বা লম্বা কয়েকটা ডাল পড়িয়া আছে। নরনারায়ণ তাহার বোঝা আনিয়াই চত্বরের উপর রাখিয়া আমায় ডাকিতেছে, হাতে একটা প্রজ্বলিত গাছের ডাল মশালের মত ধরিয়া। আমি আসিতেই সে উহা লইয়াই গুহার মধ্যে প্রবেশ করিল।

আমার একটু ভয় হইল, যদি কোন হিংস্র জন্তু থাকে। শুনিয়াছিলাম এদিকে নাকি ভল্লুক আছে; মাঝে মাঝে দেখা যায়। নারায়ণ ভিতরে গিয়া যখন মশালের আলোয় চারিদিকে দেখিতেছিল আমি কেবল উপরের ঐ বেদীর কোণে মন্দিরাকৃতি যে স্তূপ দেখিয়াছিলাম সেই কথাই ভাবিতেছিলাম। হঠাৎ দেখি গুহার মধ্যে কোন আলোই দেখা যাইতেছে না। আশ্চর্য্য হইয়া আমি গুহার মুখে যাইয়া ডাকিলাম, নরনারায়ণ! দেখি, গুহার মধ্যে প্রবেশপথের সামনা সামনি একজন মানুষ সঙ্কুচিত হইয়া ঢুকিতে পারে এমনই একটা বড় গর্ত্ত ছিল। উঁকি মারিয়া দেখি, সে সামনে ঝুঁকিয়া একখানা পাথর এক হাতে সরাইতেছে। আলোটি তখন তাহার সম্মুখে অর্থাৎ শরীরের আড়ালে ছিল তাই আমি বাহিরে দাঁড়াইয়া আলো দেখিতে পাই নাই। ক্রমে পাথরখানাকে ঠিক সুড়ঙ্গ মুখে বসাইয়া পা দিয়া দুই তিনটা ধাক্কা দিয়া দেখিল যে ঠিক মজবুদ ভাবেই বসিয়াছে, তখন সে বলিল যে, এখন এখানে থাকা যাইবে। ভিতরে একটা সুড়ঙ্গ ছিল আর সুড়ঙ্গমুখের পাথরখানা সরানো ছিল, তাই বন্ধ করিয়া দিলাম। দেখিলাম গুহাভ্যন্তর অপ্রশস্ত। একজন পা গুটাইয়া শুইতে পারে এবং মাত্র তিন হাত উচ্চ। এদিকে কোন কোন গুহার মধ্যে দ্বিতীয় গুহা বা সুড়ঙ্গ থাকে আর ঐ একখানা পাথর ঢাকা থাকে। যে গুহা ব্যবহার করিবে সে উহা বন্ধ করিয়াই ব্যবহার করিবে। পরে, প্রাতে যখন চলিয়া যাইবে উহা পুনরায় মুক্ত করিয়া রাখিয়া যাইবে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, এ সকল ব্যাপার কি? সে বলিল যে, কোন জীবজন্তু খুব সম্ভব ঐ সুড়ঙ্গ আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারে—সেইজন্য উহা আমরা মুক্ত রাখিয়া যাই। এই-রকম এখানকার নিয়ম। কোন গুহায় ঢুকিয়া যদি অপর একটা পথ বা দ্বার দেখা যায়, আর সেই মাপের একখণ্ড পাথর ঐখানেই থাকে তাহা হইলে যিনি ঐ গুহা ব্যবহার করিবেন ঐ দ্বার বা পথ বন্ধ করিয়াই ব্যবহার করিবেন। তারপর যাইবার সময় সুড়ঙ্গমুখ মুক্ত রাখিয়া যাইবেন। জিজ্ঞাসা করিলাম, যদি এখানে দীর্ঘকাল থাকে? সে

বলিল, তাহা হইলে দিনেমানে যতক্ষণ সূর্য্য থাকিবেন ততক্ষণ ভিতরের সুড়ঙ্গপথ মুক্ত রাখিতেই হইবে। শুনিলাম, এ অঞ্চলে অনেক গুহা আছে, যাহার ভিতরে ঐ প্রকার দ্বিতীয় গুহা বা সুড়ঙ্গ আছে। যাঁহারা ঐ গুহা আশ্রয় করিবেন তাঁহারা এই ভাবেই ব্যবহার করিবেন। চমৎকার ব্যবস্থা! এ ব্যবস্থা ভ্রমণকারীদের না হোক সঙ্গীবাহক-দের জানাই আছে। বাহকেরাই সাধারণতঃ পথ-প্রদর্শকও বটে, এ তো আমরা ভালই জানি।

পাঁচ

আমার মনে যেন কল্পনার ছোঁয়া লাগিল, অনেক কিছুই ভাবিতে লাগিলাম। ঐ সুড়ঙ্গ দিয়া উপরের ঐ মন্দিরাকৃতি স্তূপের নিম্নে কোন স্থানে যাইতে পারিলে দৈব-সম্পদের ভাণ্ডারে পৌছান যায় কিনা, কিম্বা উহার সহিত উপরের ঐ প্রশস্ত বেদীর কোন রহস্যময় যোগাযোগ আছে কিনা ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমায় ভিতরে শোয়াইয়া বন্ধু নরনারায়ণ গুহার ঠিক নীচেই বাহিরের চত্বরে শুইল। তাহার এক দিকে গুহার দ্বার ও দেয়াল। পা ও মাথার দিকেও দেয়াল, এক পাশে ফাঁক আর সেইখানেই তুইটা মোটা মোটা গাছের গুঁড়ি জ্বলিতেছিল। সুতরাং তাহার বিশেষ কোন কষ্ট হয় নাই। সে বলিল, আমরা ইহাকেই সুখের শয্যা বলি। সে আরও ব্যাখ্যা করিয়া বলিল, শীতের মানুষ আমরা, বড় আগুনের ব্যবস্থা থাকিলেই আমাদের ঘরের চেয়ে বাহিরে শুইবার জন্য মন বেশী টানে। এ কথা আমাদের পক্ষে সত্য কি?

যাহা হউক পরদিন প্রাতে যখন আমরা যাত্রা করিলাম তখনও আমার মধ্যে ঐ স্তূপের সঙ্গে সুড়ঙ্গের কোন যোগাযোগ আছে কিনা অথবা উপরের ঐ প্রশস্ত বেদীর নীচেই বা কি থাকিতে পারে—এ সকল কল্পনার ঘোর সম্পূর্ণ ছিল। প্রস্থানের আগেই অবশ্য সুড়ঙ্গপথ মুক্ত করিয়া ঐ প্রস্তরখণ্ড সরাইয়া দেওয়া হইল।

গোমুখ এবার চার মাইল হইবে। প্রাতে আমরা যখন যাত্রা করি তখন নরনারায়ণ বলিল, আমরা আজ আবার এইখানেই রাত্রি যাপন করিব। শুনিয়া মনে ঠিক করিলাম যে, তাহা হইলে আরও একবার ঐ রহস্যময় স্থানটি অনুসন্ধানের সুযোগ পাইব। কারণ আমার ধারণা হইয়াছিল, ঐ সুচিক্কন এবং বিচিত্র বর্ণাভায় উজ্জল শিলাস্তূপের মধ্যে কোন দৈব সম্পদ নিহিত আছে। তারপর ঐ বিস্তৃত বেদী বা শিলাময় চত্বরটিও কম প্রভাবিত করে নাই আমার মনকে। এখান হইতে বিদায়কালে বাহক বন্ধু শুধু আমা-দের লোটা তুইটি এবং গায়ের একখানা মাত্র কম্বল আর তুজনের খাবার ব্যতীত পথে অনাবশ্যক যা কিছু নিশ্চিন্ত মনে এই গুহাভ্যন্তরে রাখিয়া গেল। আমারও ইহাতে কোন সঙ্কোচ হইল না। চুরি যাইতে পারে এ আশঙ্কা অথবা এখানে কিছু রাখা উচিত নয়,

চোর থাকিতে পারে বলিয়া তিলমাত্র সন্দেহ—এ সব কিছুই হইল না, বরং মনে হইল, ইহাই উচিত এবং এ অঞ্চলের চিরাচরিত প্রথা বলিয়া মনে সাচ্ছন্দ্য অনুভব করিলাম।

আমরা যে এখন দৈবস্থানে, সম্পূর্ণ দৈবাধিকারের মধ্যে আসিয়াছি, গতকাল প্রাতঃকাল হইতেই আমার মনের প্রচ্ছন্ন স্তরে মাঝে মাঝে স্পষ্ট অনুভব করিতেছিলাম। আজ যাত্রাকাল হইতেই আমার মধ্যে একটা নেশার মত স্নিগ্ধ উত্তেজনা, কিছু দুর্লভ বস্তু প্রাপ্তির আশা, আনন্দ ও ভয় মিলিয়া অপূর্ব্ব অনুভূতির ক্রিয়া চলিতেছিল। পথের যা-কিছু অসুবিধা তা সবই ঠিক আছে। অ-সমান, নানাভাবের পাষাণস্তূপ, উহা কোথাও মলিন তুষারাচ্ছাদিত কোথাও নগ্ন নীলাভ ঘোর ধূসর, কোথাও ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় বিচিত্র বর্ণে উদ্ভাসিত ক্ষেত্রের উপর দিয়াই পথ, আর চারিদিকেই দূরস্থিত তুষারমণ্ডিত অথবা নগ্ন শৈলমালা, কোথাও কুজ্ঝটিকার মধ্যে তাহাদের শেষাংশ অদৃশ্য রহিয়াছে। চারিদিকেই এই তুষারক্ষেত্রের উপর মধ্যে মধ্যে সূর্য্য কিরণের প্রভাবে যে অনির্ব্বচনীয় মায়াময় বায়ুমণ্ডলের সৃষ্টি করিয়াছে উহা ভাষায় বর্ণনা করিয়া বুঝাইবার নয়। উহা বাহ্যদৃষ্টির বিষয় হইলেও মূলতঃ সেটা অনুভূতিরই বিষয়। তাহার মধ্যে যেটা বলা যায় তাহাই বলিতেছি। গাছপালা আর নাই। এখন কেবলই পাষাণস্তূপ, আর বহু উচ্চে তুষারমণ্ডিত শৈলমালা।

যে প্রান্তরের মধ্য দিয়া এখন আমরা দুইটি প্রাণী চলিতেছি, আজ তৃতীয় দিন হইল গঙ্গোত্রী হইতে বাহির হইয়া অবধি গঙ্গোত্রীর নিকটস্থ পথে কোন গুহায় একটি সাধু ছাড়া তৃতীয় মানুষের সঙ্গে আমাদের দেখা হয় নাই। সুতরাং লোকসমাগমশূন্য বলিয়াই এই স্থানের মাহাত্ম্য এত গভীর। আরও একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার—প্রকৃতি জননীর লীলা ব্যতিত আর কি বলিব। আমরা যে স্থান দিয়া যাইতেছি, ঐ কঠিন নানা আকারের আলগা প্রস্তরের স্তূপ, চারিপার্শ্বেই অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিবিধ বর্ণের পুষ্পগুচ্ছ পদদলিত করিয়া চলিতেছি, সামলাইয়া অথবা না মাড়াইয়া যাইবার উপায় নাই। প্রখর সূর্য্যকিরণে যতদূর পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে, যেন বিচিত্র একখানি কার্পেট—এখানে লাল, নীল, বেগুনী, পীত, শ্বেত হরিৎ, সিঁদুর কোন বর্ণের অভাব নাই। এই প্রকার অপূর্ব্ব বর্ণের সমাবেশ হিমালয়ের এতটা উচ্চস্তরের তুষারাবৃত ভূমিতেও সম্ভব, যেখানে কেহ দেখিবে না। এমন স্থানে কাহার মনোরঞ্জনের জন্য এ বৈচিত্র্য সমাবেশ? ভাবিতে প্রাণ কেমন করিয়া উঠে।

এই সকল উপভোগ করিতে করিতে চলিয়াছি, পথ যতই অসচ্ছন্দকর কষ্টসাধ্য হোক না কেন, নয়নাভিরাম দৃশ্যাবলীই আমাদের অধিকতর আগ্রহ সহকারে কঠিনতম পথে চলিবার শ্রমশক্তি যোগাইতেছে। অপূর্ব্ব এই পথ বা প্রান্তর মধ্যে ভাগীরথীর স্রোত। দুই পার্শ্বে পর্ব্বত কখনও নিকটে কখনও দূরে সরিতেছে, তাহার মধ্যেও এই স্রোতস্বিণীর

গতির সঘন হুঙ্কারে শ্রবণ অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত রহিয়াছে। দৃষ্টির কথা তো বলিয়াছি, শরীর আমার পা দুটিকে সম্বল করিয়া সবাধে অগ্রসর হইতে ব্যস্ত। আর মন কল্প-লোকের কত কি আস্বাদন করিতে করিতে চলিয়াছে। সব মিলিয়া মনে হয়, আমি হারাণো, বহুকাল নিরুদ্দিষ্ট প্রিয়তমকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছি।

পাহাড় দূরে সরিয়া গেল। এক বিস্তৃত উপত্যকার উপর দিয়া বোধ হয় পূর্ব্বমুখেই চলিতে লাগিলাম মধ্যস্থিত ভাগীরথীপ্রবাহ ধরিয়া। উপত্যকার এই পথে একবার পূর্ব্ব মুখে চলিয়াছি, কতক দূর চলিয়া আবার কতক দক্ষিণে বাঁকিয়া চলিয়াছি গঙ্গার স্রোত যে পথে আসিতেছে। দুই পাশে ক্রমোচ্চ তুষারমণ্ডিত নানা আকারের শিলাস্তূপ, তাহার ব্যবধান কোথাও বিশ হইতে বাইশ হাত, কোথাও বা আরও কিছু কম কোথাও কিছু বেশী। তাহার মধ্যস্থিত ঐ স্রোত কে জানে কোথা হইতে দুর্দ্দান্ত চঞ্চল গতিতে নামিয়া আসিতেছে। তাহার কলধ্বনি এই উপত্যকামধ্যে আর নাই, একটানা গুরু গম্ভীর হুহুঙ্কারে পরিণত হইয়াছে। আর স্রোতের তীব্রতা? ভাষায় বর্ণনা অসম্ভব। এই ভাবে কতক্ষণ গেল।

পদদলিত পুষ্পগুচ্ছের রং এবং আকৃতির বৈচিত্র্য দেখিতে দেখিতে যেন কি এক গভীর রহস্যময় সত্তার ধ্যানে চলিতেছিলাম। হঠাৎ পশ্চাৎ হইতে নরনারায়ণ বলিয়া উঠিল, বো দেখো! চাহিয়া দেখি, সম্মুখে দুইটি তুষার-শৃঙ্গ। অল্প ব্যবধানে দুইটি চূড়া যেন হরগৌরীর অথবা গৌরীশঙ্করের মতই প্রকট। কী মাধুর্য্যই তাহার মধ্যে ছিল জানি না,—মুহূর্ত্তেই আমাকে একেবারে যেন আত্মসাৎ করিয়া লইল। উহাই গঙ্গোত্রী গ্লেশিয়ারের পশ্চাতে সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গদ্বয়। উহারই পাদদেশ হইতেই গোমুখ পথে ভাগীরথীর উদ্ভব। নারায়ণের মুখে এই কথা শুনিয়া প্রাণ যেন ছুটিয়া যাইতে চাহিল। প্রাণ চাহিলে কি হইবে, চরণ যে ভারি হইয়াই আছে, দেশ ও কালের অলঙ্ঘনীয় নিয়মেই তাহাকে যাইতে হইবে ব্যবধানের সকল মাটি, পথের তুষারটুকু অতিক্রম করিয়া। সম্মুখেই অবস্থিত আমাদের গন্তব্য ঐ তুষারপর্ব্বত। এখান হইতে আমাদের দক্ষিণে আরও একটি তুষারমণ্ডিত পর্ব্বতশৃঙ্গ দূরে দেখা যাইতেছে, উহার নামটি এখন মনে নাই। বোধ হয় স্বর্গারোহণ হইবে। পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির মহারাজ ঐ পথেই স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। এখান হইতে ঐ অঞ্চলে যাইতে হইলে সুদুর্গম গঙ্গোত্রী গ্লেশিয়ার পার হইয়া পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে সোজা প্রায় পঁচিশ মাইল কঠিন পথ। সে পথে কেহ যাইতে পারে না। এইভাবে চলিতে চলিতে আমরা তিন চারিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধারাও পার হইলাম।

এখন হইতে আর আমার দৈহিক জ্ঞান রহিল না। নেশায় মত্ত একজনের মতই আমার মনের অবস্থা লইয়া চলিয়াছি। দ্রুতই চলিয়াছি। দক্ষিণে গঙ্গাধারার পাশে পাশে যতটা নিকট সম্ভব। পূর্ব্বে শীতে কাতর করিয়াছিল, এখন শীত-বোধই নাই। চলিয়াছি, আগে আমিই দর্শন করিব।

গঙ্গাতীরের পথ কতক সমতল, বালি ও নোড়ানুড়ি ছড়ানো, যেমন পূর্ব্বে দেখিয়াছি। এখন সেইভাবে সৈকত অতিক্রম করিতে করিতে সম্মুখে ক্রমোচ্চ সত্য সত্যই এক বিরাট পর্ব্বতপ্রমাণ স্তূপ পাইলাম। বিবিধ আকারের ভগ্ন পাষাণে নির্ম্মিত যেন উপরের স্তরটি সবই আল্‌গা, পা দিলেই নড়িতেছে অথচ ঐভাবে একটার উপর একটা অতিক্রম না করিলে অন্য উপায়ও নাই। সৈকতের নিকট ঐ পাহাড়ে উঠিয়া পার হইতেই আবার

ঐ ভাবের বালুকাময় সমতল সৈকত ভূমির কতকটা পাওয়া গেল। আশ্চর্য্য, তারপরেই আবার ঠিক ঐভাবের অবিকল একটি পাহাড় বা বিশাল ভগ্ন শিলাময় স্তূপ। এইরূপে মধ্যে মধ্যে সৈকত ব্যবধানে উচ্চ পর্ব্বতাকারে পরপর চার-পাঁচটি স্তূপ অতিক্রম করিয়া আমরা একটি বিশাল শিলাস্তূপের উপর উঠিয়া একবার চারিদিক দেখিয়া লইলাম তার-পর একটু বসিলাম এবং জলযোগ করিয়া লইলাম। আর কতদূর ?—জিজ্ঞাসা করিলাম।

সে মুখে কিছুই না বলিয়া লাঠি-লোটা-কম্বল উঠাইয়া চলিতে আরম্ভ করিল। আমরা দুইজনে পাশাপাশি চলিতেছি। বন্ধু আমার আজ বড়ই গম্ভীর।

কিসের শব্দ কাণে আসিতেছে? বন্ধু বুঝাইয়া দিল ঐ সব আল্‌গা বরফে ঢাকা পাথর দূর হইতে যেন ধবল তুষারস্তূপ বলিয়াই মনে হইতেছে, সূর্য্যকিরণে তলস্থ তুষার গলিয়া উপর হইতে সশব্দে ভাগীরথীর জলে পড়িতেছে। এই প্রান্তরে তাহার শব্দ ঐ রকমই হইয়া থাকে। হঠাৎ শুনিলে ভয় হয়। যেখানে ঐ আল্‌গা তুষারমণ্ডিত শিলাগুলি স্রোতের নিকটে আছে, সেইখান হইতেই পড়িতেছে বুঝিয়া বর্ত্তমানে ধারার নিকট দিয়া সাবধানে যাইতে লাগিলাম। যে কোন মুহূর্ত্তেই পদতলের আলগা পাথরখানি খসিলেই হইল—হড়কাইয়া একেবারে গভীর নীচে নদীগর্ভে।

এখন সম্মুখে এবং দুই পাশেই তুষারমণ্ডিত বিচিত্র আকারের পাষাণস্তূপ ব্যতীত আর কিছুই নাই। দূরের পর্ব্বত ক্রমোচ্চ তুষারক্ষেত্রের মতই দেখা যাইতেছে। উহা ঠিক তুষার নয়, বরফ কঠিন হইলে যেমন স্বচ্ছ ও নীলাভ হয় সেইরূপ দূরে সর্ব্বোচ্চ শিখর দেশ—নীল ধূসর বর্ণ দেখাইতেছে। আরও কতকটা অগ্রসর হইতেই একটা উচ্চ স্তূপের উপর দাঁড়াইয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে বাকশক্তি রহিত হইয়া গেল। আনন্দ ও উত্তেজনায় মনে হইল আমি আর এ ধরায় নাই।

দেখিলাম, আমার সম্মুখেই প্রায় পঁচিশ কি ত্রিশ হাত দূরেই এক ক্রমোচ্চ তুষার পর্ব্বতের প্রায় নিম্ন দেশে অপূর্ব্ব কঠিন তুষারনির্ম্মিত স্বচ্ছ নীলাভ একটি প্রকাণ্ড গুহা উপর দিকে ঘন প্রস্তর স্তূপ জমাট বরফে নির্ম্মিত একটা গম্বুজের আকৃতি, মনে হয় যেন মন্দির ছিল কোনকালে সম্পূর্ণই এখন ইন্দ্র দেবতার কোপে পড়িয়া হয়তো বজ্রের আঘাত সহ্য করিতে হইয়াছে, ফলে মন্দির চূড়াটি ধ্বংস হইয়া গিয়াছে এবং বর্ত্তমান আকারে আমাদের সম্মুখেই যেন কপাটহীন মুক্তদ্বার মন্দির। গঙ্গার প্রবল ধারাটি এখানে বাঁ দিকে বাঁকিয়া সেই গুহার নিম্নস্তরের সঙ্গে এক হইয়া গিয়াছে। মনে হইতেছে সেইখান হইতেই অতীব প্রবল বেগে অন্তরস্থ কোন সুড়ঙ্গপথে প্রবাহিতা ভাগীরথী বাহিরে আসিয়া ধরণীর পানে ছুটিয়া চলিয়াছে। আরও একটু নিকটে গেলাম। এইটিই যদি উৎপত্তি স্থান হয়, তাহা হইলে এখানেও দশ পনেরো ফিট চওড়া, কেন? ইহার পর আর কোথাও ধারা দেখা যায় না। ঐ অপরূপ গুহা হইতে যে ভাবে প্রবল বেগে বাহির হইতেছে তাহার দমকে উপরের বরফ খণ্ড খণ্ড হইয়া স্রোতগর্ভে পড়িতেছে। কাজেই ঐ মন্দির বা গুহা-মুখে খণ্ড খণ্ড ছোট বড় বরফের চাঁইও যত আর প্রস্তরখণ্ডও তত স্রোতের সঙ্গে দুর্দ্দান্ত বেগে গড়াইতে গড়াইতে নীচে চলিতেছে। এই গুহানিম্ন-পথই এখানকার গোমুখ।

এ ক্ষেত্রে আমি একটি মাত্র ডুব দিয়া জন্মজীবন সার্থক করিতে পারিয়াছিলাম, বন্ধু নরনারায়ণ স্পর্শ করিয়া তৃপ্তি পাইল।

এক

যে ঘটনা চক্রে এই পর্য্যটনে আমায় বর্ত্তমানে এই গোমুখের উপর স্তর দিয়ে আসল গোমুখের অনুসন্ধানে আকৃষ্ট করেছিল সে ঘটনাটি এই, আমার পথ প্রদর্শক নরনারায়ণ, এই গোমুখ গুহার সামনে এসে প্রতিবাদ, এমনকি দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করলে যে এটা কখনই আসল গোমুখ নয়, এতটা চওড়া স্রোত যেখানে সেটা কখনও কি গঙ্গার উৎপত্তি স্থল হতে পারে? অবশ্য আমার নিজের বিশ্বাসও ঐ রকম। সে আরও বল্লে, আসল গোমুখ এখান থেকে আরও উপরে, ঐ যে উত্তর ভাগে বিস্তীর্ণ তুষারভূমি ক্রমোচ্চ হয়ে যে তুষার পর্ব্বতের সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছে ঐ পর্ব্বতেব উপরেই আসল গোমুখ। ওখানে মানুষ যেতে পারে না, কারণ ঐ সব স্থান দেবতাদের অধিকারে,—অলকাপুরী ঐ পথে যেতে হয়। সে পথের মধ্যে একটা স্থান আছে সেখানে তুষারেব ঝড় বৃষ্টি বিপদ-সঙ্কুল সর্ব্বক্ষণ। মধ্যে একটা গিরি সঙ্কট পেরিয়ে যেতে হয় তবে তো আসল গোমুখে যাওয়া যায়। মানুষের অগম্য সে স্থান। তবে যদি কোন প্রকারে একবার যাওয়া যায় তা হলে মানুষ দেওতা হয়ে আসবে।

সুতরাং আমি দেবতা হয়ে ফিরে আসবার সংকল্প তখনই সেই খানে ত্যাগকরে দিলাম। কিন্তু দৈব বিড়ম্বনা বিশেষতঃ এই দেবতার ক্ষেত্রেই ও সকল সংকল্প ওলট পালট হয় গেল। গোমুখে ঐ বিশাল বরফের গুহার সামনে কিছুক্ষণ থাকবার পরে কেমন একটা উত্তেজনা অনুভব করলাম। সম্ভবতঃ আমার একটা উন্মাদনা এসেছিল এই কথা বললেই ঠিক হয়। যে উন্মাদনায় একজনের জীবন বিপন্ন হবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা থাকে এটা সেই ভাবেরই। আমার উৎসাহের ছোঁয়াচ নর নারায়ণেরও লেগেছিল এবং সে আমার সঙ্গী হবার জন্য ঝুঁকেও ছিল, কিন্তু তাকে এ গৌরবের অংশভাগি করতে প্রাণ চাইলো না। শেষে একলাই যাত্রা করলাম সে আমার জন্য তিনটি দিন মাত্র অপেক্ষা করবে সেই গুহায়, তার সঙ্গে এই কথাই রইলো।

* * *

যেখানে গঙ্গার ধারা প্রবলবেগে তুষার পর্ব্বতের নীচে ঐ গুহা মন্দির থেকে যেন হঠাৎ বেরিয়ে আসচে ঐ অবধি সাধারণ যাত্রীদের গতি।

দক্ষিণে বামে দুদিকেই ত বরফে ঢাকা বড় বড় পাষাণ স্তূপ, ডান দিকটা এমন ভাবে খাড়া তার উপরে উঠবার যো নেই, কিন্তু বাঁদিকে যে বড় বড় বরফ ঢাকা পাষাণ খণ্ড তার উপর উঠবার চেষ্টা সফল হতে পারে, একবার যদি ওঠা যায় তা হলে উপরে অনেকটাই যাওয়া যাবে, চাইকি আসল গোমুখের পথে খানিকটা তো দেখে আসা যাবে তারপর দ্বিতীয় দিনে সবটাই মেরে দেওয়া যেতে পারবে, তখন নরনারায়ণকে সঙ্গে নিয়ে এসে যাত্রা সম্পূর্ণ করা যাবে, এই ছিল আমার কথা। বর্ত্তমানে ঐ গোমুখ গুহার সামনে দাঁড়িয়ে যেখান থেকে বরফের চাঁই মাঝে মাঝে দুম-দাম শব্দে পড়চে গুহার মধ্যে থেকে আর হু হু শব্দে বেরিয়ে দ্রুতগতি স্রোতে এঁকে বেঁকে চলেছে ঐ তুষার প্রান্তর ভেদ করে। সে স্রোতের উপর দিকে গুহার মধ্যে যে ধারা তার কোন উদ্দেশই নাই। খানিক আরও উপরে যেতে হবে, না হলে গোমুখী দেখা হবে না। আমি ঠিক করলাম গুহার উপরে উঠে চার দিক ঘুরে একবার দেখা যাক্ যে কোনো দিকে এর কোনও সূত্র দেখা যায় কিনা এই ঠিক করে আমিতো উঠলাম বাঁদিক দিয়ে ঐ গুহার উপরে।

বরফটা সেখানে জমাট হয়ে একদিকে পাহাড়ের সঙ্গেই বেশ কতকটা উঁচু হয়ে মিশে রয়েছে। তারপর সেই পাহাড়ের স্তর অনেকটা লম্বা উত্তর পশ্চিমে চলে গিয়েছে। আমি সেই স্তূপ ধরে বরাবর চারদিকে ঘুরে দেখতে দেখতে একদিকে যেন কতকটা নীচে কুলু কুলু ধ্বনি শুনতে পেলাম। তাই ধরেই আরও কতকটা গিয়ে ভাঙ্গা তুষার চাপের ফাঁকে ফাঁকে গঙ্গার ধারাও দেখতে পেলাম। ভরসা হোলো, এই ধারা ধরে গেলে হয়ত গোমুখীর উদ্দেশ পাবো।

তখন হাঁফ ধরতে আরম্ভ করেছে, বেশ শ্বাসকষ্ট অনুভব করছি। দু'খানা রুটি আর একটু হালুয়া ছিল সঙ্গে, সেটা চলতে চলতেই খেয়ে নিলাম, একটু বল পেয়ে আরও খানিকটা চললাম বটে, কিন্তু খুব বেশী উঠতে পারলাম না। সব শুদ্ধ দুই মাইল আন্দাজ এসেছি, কিন্তু এদিকে মা গঙ্গার মূলধারার আর কোনও উদ্দেশ না পেয়ে ক্রমেই বেশ হতাশ হয়ে পড়লাম। আর এদিকে তৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফাটচে ; গলাও শুকিয়ে উঠেছে। তার উপর শ্বাস কষ্ট।

ফিরতেই হোলো শেষ অবধি। যে পথে গিয়েছিলাম সেই দিক দিয়েই ফিরছি মনে করে একটু দ্রুতই পা চালালাম। সহজেই এখনও চলতে পারছি দেখে বেশ আনন্দ ছিল মনে। বিস্তৃত এ তুষারক্ষেত্রে এসে মনে হলো এইটি উত্তীর্ণ হলেই সেই গুহা মন্দির পাবো, যদিও এখান থেকে তার কিছু চিহ্নও দেখা যায় না। মাঝে মাঝে কেবল মনে হচ্ছিল যে, আমি দক্ষিণ দিকেই চলেছি, কারণ উত্তর পশ্চিম মুখেই যাত্রা করেছিলাম সেটা মনে ছিল। ফিরে সেইখানেইত যাব। এইভাবে যেতে যেতে ক্রমে মনে হল,

সে তুষার প্রান্তর তো এতটা ছিল না যেখান থেকে যাত্রা করেছিলাম। এ তুষার-ভূমি যে এখনই শেষ হবে তাতো মনেই হয় না। এ দিকে সন্ধ্যাও বোধ করি এগিয়ে আসছে এখন আর বেশী ভাববার সময়ও নেই।

পথ বলে ত কিছু নেই, সুমুখে সবই সাদা, মালভূমির মত কোথাও কতকটা উঁচু, না হয় নীচু, স্তূপাকার তুষার। মাথার উপর আকাশ আছে বটে, কিন্তু দিনকরের কোন চিহ্নই নেই তার মধ্যে। কারণ সারা আকাশ একটা এমন অদ্ভুত আলো ছায়া মিশানো কুজ্ঝটিকার আবরণে ঢাকা যা' ভেদ করে অস্তগামী সূর্য্যের অস্তিত্ব আবিষ্কার করা এ চক্ষের কাজ নয়। তা' ছাড়া চক্ষে সারাদিন তুষার ধবল রূপ দেখতে দেখতে চক্ষু ভার আর বেদনা হয়ে একটু একটু জল পড়ছিল,—বোধ করি লালও হয়েছিল। কাজেই অন্তরে মহা উদ্বেগ নিয়ে ভাল করে চারদিক দেখে কোন্ দিক যাব ঠিক করবার জন্য একবার দাঁড়ালাম। আমার দিক্‌ভ্রম হয়েছিল সে কথা না বললেও চলে। ডানদিকে দেখছি, যতটা দেখা যায়,—বোধ হল যেন কতকটা দূরে একটি বড় কালো বিন্দু। সেটা যে তুষারমণ্ডিত পাহাড়ের গা থেকে বরফ ঝরা গহ্বরের কালো দাগ নয় তা' বুঝতে পারা গেল তার গতি দেখে। মানুষ শরীরের মাথাটা একটি বড় বিন্দুর মত, পিছনে তুষার থাকায় কালো দেখাচ্ছে। একটি মানুষ নীচু থেকে এক এক ধাপ উঠলে যেমন একটু একটু করে শরীরের অংশ ক্রমে ক্রমে দ্রষ্টা একজনের চক্ষে পড়ে সেই রকম ঐ বড় এবং কালো ফোঁটাটি একটু একটু বাড়তে বাড়তে দুই তিন মিনটের মধ্যেই তুষার স্তূপের নীচে থেকে সম্পূর্ণ অবয়ব একটি মানুষের মূর্ত্তি হয়ে ফুটে উঠলো, আর এদিকেই আসছে বুঝা গেল। আরও একটু কাছে এলে দেখা গেল হাতে তার একটি দীর্ঘ দণ্ড আছে।

তার মাথায় সেকালের শিরস্ত্রাণের মত একটা কিছু আছে, আর সর্ব্বাঙ্গ ঘোর লাল রংয়ের মোটা কাপড়ে ঢাকা—কেবল নাক মুখ চক্ষু ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। পাকানো গোঁফ আর গৌরবর্ণ দেখে প্রাচীন আর্য্য হিন্দু ক্ষত্রিয় জাতির যে ভাবের চেহারা, মনে হয় সেই রকম মূর্ত্তি।

দেখতে দেখতে কতকটা এগিয়ে মানুষটি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে যেন সুমুখে নীচে জমির উপর একটা কিছু লক্ষ্য করছে বোধ হ'ল। তখনও আমা থেকে অনেকটা তফাৎ, পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছে না। হাতে সেই দণ্ডের নীচে যে লোহার খোঁচা—তাই দিয়ে সেই তুষারস্তূপের উপর খোঁচা দিয়ে অনেকটা তুষার সরিয়ে ফেল্‌লে। তার পর দেখি হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো সেইখানে, আর সেই জায়গা থেকে ডান হাত দিয়ে কিছু তুলে নিয়ে বুকের মধ্যে পূরে রাখলে। আবার উঠে সুমুখ দিকে চলতে সুরু করলে দণ্ডটি হাতে নিয়ে।

সে ব্যক্তি আমাকে নিশ্চয় দেখেছে,—কারণ সে আমার দিকে লক্ষ্য করেই এগিয়ে আসছে,—আমিও পায়ে পায়ে কতকটা এগিয়েই চলেছি। ক্রমে আমরা দশ বারো হাতের ব্যবধানে এসে পড়লাম।

দীর্ঘ শরীর যাকে বলে, বোধ হয় সাড়ে ছয় ফুট লম্বা, সেই অনুপাতেই চওড়া। মাথায় কিরীটি অর্থাৎ শিরস্ত্রাণ, পূর্ব্বকালে যোদ্ধারা যে রকম ব্যবহার করতেন। তবে তার নীচের দিক পাগড়ির মত কান পর্য্যন্ত ঢাকা। উজ্জ্বল চক্ষু, তার উপর চওড়া গভীর কালো ভ্রূ, দীর্ঘ খড়্গ নাসা, তার নীচে পরিপাটি উর্দ্ধমুখী গোঁফ, যেন একটি আর্য্য দেবমূর্ত্তি। ঘোর লাল মোটা পশমের কারুখচিত উত্তরীয়, কটিতে কোমরবন্ধ, বাঁদিকে তার একখানি কৃপাণ। নিম্নাঙ্গে হাঁটু অবধি ঝোলা লাল পশমের কাপড় ঝুলছে কটিবন্ধ থেকে। পায়ে মোটা পশু লোমের বুট তিব্বতী ধরণের। হাতে তার একটি দণ্ড, তার নীচের দিকটা খোন্তার মত। উজ্জ্বল গৌরববর্ণমুখমণ্ডলে গোঁফ দাড়ি, আর উজ্জ্বল নীলবর্ণ চক্ষুতে অপরূপ দীপ্তি দেখলে, এ ব্যক্তি যে মহাশক্তিশালী সে বিষয়ে আর কোন সংশয় থাকে না। এমনই এ মুর্ত্তি মুখের প্রতি দৃষ্টিমাত্রই সম্ভ্রমের দাবী আনে।

কথা কওয়ার মত কাছাকাছি এলে আমিই আগে গিয়ে, প্রথমে হিন্দীতে সম্ভাষণ করে আমার বিপদের কথা জানিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম যে গোমুখী এ দিকে কোথায় কত দূর? আমি বিপন্ন ও আশ্রয়প্রার্থী।

আমার কথায় তিনি কান দিলেন কিনা কিছুই টের পাওয়া গেল না। দেখলাম, তাঁর লক্ষ্য আমার সুমুখে তুষারক্ষেত্রের উপর। কোন কথা না বলে তিনি সটান এগিয়ে সেই স্থান লক্ষ্য করে;—তারপর হাতের সেই খোন্তা বাগিয়ে খুঁড়তে আরম্ভ করে দিলেন সেইখানে। কতকটা খুঁড়তেই একটা ছোটখাটো গর্ত্ত হয়ে গেল। তিনি যেন তার মধ্যে কি দেখতে পেয়ে হাতের দণ্ড ফেলে দিয়ে, সেখানে গরুড় আসনে বসে পড়লেন, তারপর সেই গহ্বরে হাত ঢুকিয়ে দুই তিনটি স্বচ্ছ পিঙ্গলবর্ণ ডিম্বাকৃতি বস্তু বার করে তৎক্ষণাৎ তাঁর উত্তরীয় ভেদ করে বুকের মধ্যে রেখে দিলেন। তারপর দণ্ডটি গ্রহণ করে আবার উঠে দাঁড়িয়ে এইবার আমার দিকে প্রসন্ন বদনে দৃষ্টিপাত করলেন। তারপর ঈষৎ হাস্যে আমাকে মুগ্ধ করে তাঁর সঙ্গে আসতে ইঙ্গিৎ করলেন এবং ধীরে পাদক্ষেপে অগ্রসর হয়ে চললেন। তাঁর চাহনীর মধ্যে এমনি একটা বিশ্বাস, ভরসা এবং

প্রীতির নিদর্শন ছিল যা'তে আমার ধারণা হয়ে গেল যেন তিনি আমার পরম বন্ধু এবং পরম সহায়। আমার মনে তাঁহার আবির্ভাব পূর্ণ দৈব অনুগ্রহ বলেই মনে হোলে অন্তরক্ষেত্রও উজ্জ্বল হয়ে উঠলো সে কথা ভেবে।

যে পথে সেই দ্বিপ্রহর থেকে আমি চলছিলাম সেটা কোন গিরিসঙ্কট, তার কথা আগে শুনিনি বা নামও জানিনি। নরনারায়ণ এই গিরিসঙ্কটের কথা বলেছিল কিনা তা ঠিক তখন ধারণা করতে পারিনি তবে, এটা বুঝেছিলাম যে, গঙ্গোত্তরী অঞ্চলেই এটি অবস্থিত তবে সেটা ঠিক তার কোন্ দিকে তা'ও ঠিক করতে পারিনি।—খুবই সম্ভব উত্তর পশ্চিম ভাগেই এই স্থান, যেহেতু হিমালয়স্থ সকল গিরিসঙ্কটগুলিই উত্তর দিকে। যাই হোক, এখন আমার দুর্ব্বল শরীরে তাঁর সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারছি না দেখে, তিনি প্রসন্ন মনে আমার হাত ধরলেন। যেই মাত্র দৃঢ় শক্তিশালী প্রসারিত একটি বাহু এসে আমার মণিবন্ধ মুষ্টিগত করলে সেই উষ্ণ করতলগত শক্তির পরশে আমার শরীর পুলকিত হয়ে উঠলো, আমার যত দুর্ব্বলতা মুহূর্ত্তে মিলিয়া গেল। এখন বিনা আয়াসেই যেন চলেছি।

এই ভাবে চলতে চলতে এমন একটা ক্ষেত্রে এসে পড়লাম যেখানে তুষার স্তূপের আশে পাশে তুষারশূন্য অথবা ঝরা তুষার কালো কালো পাথরের চাঁই আর তারই কোলে কোলে ঈষৎ শুক্ল এবং ঘোর হরিৎ বর্ণের ছোট ছোট পাতা একপ্রকার গুল্ম দেখা যাচ্ছিল। সেখান দিয়ে যেতে যেতে আমার মধ্যে নেশার মত একটা আবেশ যেমন বেশী ভাং খেলে হয় সেই রকম বোধ হোলো,—স্নিগ্ধ একটা মাদকতায় ক্রমে ক্রমে আমার মস্তিষ্ক যেন আচ্ছন্ন হয়ে আসচে। সেই সঙ্গে বাতাসে কেমন সুন্দর এক বিচিত্র মিষ্ট গন্ধ, যা' কখনও জীবনে অনুভব করিনি, বোধ হয় ঐ গুল্মলতা থেকেই তার উৎপাত্ত। এইভাবে যেতে যেতে ক্রমে যেন কিছুক্ষণ আমার সংজ্ঞালোপের মত অবস্থা এসেছিল। সেটি বুঝলাম হঠাৎ যখন আমার চমক্ ভাঙ্গবার মত হল। দেখলাম দৃশ্য পরিবর্ত্তিত হয়ে গেছে, এখন চারদিকে আর সে তুষার স্তূপ বা ধবল দৃশ্য নেই, আমি যেন নেমে চলেছি, এক বিস্তৃত ক্রমনিম্ন সরল উত্‌রাইয়ের পথে। আগে আগে তিনি দণ্ড হাতে ধীর দৃঢ় পাদক্ষেপে চলেছেন ; আমি মুক্ত, তিনি আর আমার হাত ধরে নেই। কখন ছেড়ে দিয়েছেন জানতেও পারিনি। তখন আর আমার মধ্যে কোন মাদকতার প্রভাব নেই।

দুই

উত্‌রাই সুখকর যদি তার পরে আবার চড়াই না থাকে। তখন সময়টা প্রায় সন্ধ্যাবেলা। অন্ধকার হয়নি, আলো আছে তাতে সুমুখে অনেক দূর দেখা যাচ্ছে, সোজা বহু দূর, কোন ব্যবধান নেই। বহু দূরে, নীচে, যেন বিশাল এক সমতল ভূমি,

তাতে ঘন তরুলতায় উজ্জ্বল হরিৎ বর্ণের বিস্তার এমন সুন্দর অপরূপ দৃশ্য এ যাত্রার মধ্যে কোথাও দেখিনি।

বলেছি এই উত্‌রাইক্ষেত্র নেমে গেছে বহুদূর, বিস্তৃতির সীমা তার এখান থেকে দু'ক্রোশও হতে পারে, তার বেশীও হতে পারে। বিস্তৃত সোজা ক্রমনিম্ন ক্ষেত্রের কোথাও একটি তৃণ পর্য্যন্ত নেই। যেমন উপর থেকে ধূসর বর্ণের একখানি পাথর দিয়ে নীচের ঐ সমতল শ্যামল ক্ষেত্রের চারিদিক মণ্ডলাকারে ঘেরা। কোথাও এর একটু ফাঁক বা ফাটা দাগ বা খাঁজ খোঁজ নেই। উঁচু চূড়া মন্দির, নানাবর্ণের বহু সৌধ, সেই অপরূপ সমতলভূমির হরিদ্বর্ণের গাছপালা ভেদ করে এখান থেকে অস্পষ্ট যেমন দেখা গেল তাতে বোধ হয় প্রান্তে এটি একটি বেশ প্রকাণ্ড নগর। আরও বোধ হ'ল আমরা ঐখানেই যাব। এ ভাবের চক্রাকার সমউচ্চ পর্ব্বত বিরাট প্রকৃতির সৃষ্টি তা এখানে এসে দাঁড়ালে সহজেই বুঝা যায়। হিমালয়ের মধ্যে এই আশ্চর্য্য প্রদেশ কেউ আগে দেখেছে কিনা জানি না এবং কোন পর্য্যটকের বিবরণেও দেখিনি।

যাই হোক, আমরা এই বিশাল উত্‌রাইটা যেন উড়ে নেমেছিলাম। যখন প্রায় শেষ প্রান্তে এসেছি অদূরে একটি স্রোত, বেশ চওড়া, প্রায় আমাদের কলকাতার গঙ্গার অর্দ্ধেক হবে, আর তর্‌তর্ চলেছে তার স্রোত দেখা গেল। এপারে একটি তৃণ পর্য্যন্ত নেই, কিন্তু ওপারে গাছপালা ঘন আর তারই মধ্যে নীচের দিকে সাদা লম্বা রেখা; মনে হল যেন পথ। সেই নদীতীরে পাঁচ ছয়জন লোক দেখলাম। তখনও ঘোর অন্ধকার হয়নি, সামান্য আলো আছে কিম্বা শুক্লপক্ষের সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে বুঝা গেল না। আমার যিনি সহায়, সেই দেবমূর্ত্তি, তাদের কাছে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই তারা তাঁকে দেখে একসঙ্গেই ডান হাত তুলে, হো—ভো—শব্দে একটানা সুরে গম্ভীরভাবে কি যেন বললে। তারপর কাছে যেতেই সকলে তাঁকে আলিঙ্গন করলে। কেউ আমাকে দেখলে কিনা বুঝলাম না, কারণ কেউ আমায় কিছু বললেও না, বোধ হল যেন আমাকে তারা লক্ষ্যই করলে না।

সুগোল আকৃতি, এক কোমর উঁচু, বাটির মত, দশ বারোজন ধরে এমনই একটি নৌকার মত সেই স্রোতের জলে বাঁধা ছিল। আমার সহায় যিনি, তিনি সবার আগে আমার হাত ধরে তাতে উঠলেন। ভিতরে নরম বেশ স্থূল আসন পাতা, তিনি সেখানে বসলেন এবং আমাকেও বসতে ইঙ্গিৎ করলেন। তারপর ঐ পাঁচজনের একজন তাইতে উঠলো। সে ব্যক্তি কিন্তু বসলো না, একটি দণ্ড সেই বাটীর কিনারায় ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো, আর সেই বিরাট বাটি প্রথমে এক পাক ঘুরে গিয়ে চলতে লাগলো। প্রথমটা ধীরে ধীরে, তারপর সন্‌সন্ করে তীরের দিকে চলতে লাগলো। একটুও কাত হলনা

কোন একদিকে কম বেশী ভার হলে যেমন এদিক ওদিক হয়, তার কিছুই নয়। স্থির গতিতে সেই বিচিত্র জলযান এসে এপারে লাগতেই দাঁড়িয়ে দেখি দুইজন অবিকল ঐরকম পোষাক, হাতে ঐরকম দণ্ড, দাঁড়িয়ে।

আগে তিনি নেমেই ডান হাত তুলে সেই রকম হো-ভো স্বরে কি বলে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে তারাও অবিকল ঐ রকম করে শেষে আলিঙ্গন। পরে তিনি আমায় পিছনে আসতে ইঙ্গিত করে তাদের সঙ্গে চলতে লাগলেন। কোন কথা নাই। এতক্ষণে

আমার স্মরণ হোলো এখানে শীত নাই, গ্রীষ্মও নাই। বেশ স্মরণ আছে যখন বরফের উপর দিয়ে চলেছিলাম তখনও আমার ভিতরে ভিতরে ঘাম হয়ে গেঞ্জিটা ভিজে গিয়েছিল। উত্‌রাইয়ের মুখে আর শরীরে সে রকম শ্রমজলের কোন লক্ষণ প্রকাশ পায়নি।

আমরা তিনজন কতকটা এসে একটি সিং দরজার সুমুখে দাঁড়ালাম। দ্বারপথে কপাট নাই. কেবল দু'দিকে খুব উঁচু মোটা করে গাঁথা প্রশস্ত দেয়াল আর উপরে স্তূপাকার খিলান। সেই খিলানের নীচের ছাদে একটি প্রকাণ্ড, অনেক, বোধ করি শতাবধি হবে, পাপড়ি সাজানো পদ্ম একটি। সেইখানেনীচে দু'দিকে উঁচু আসন রাখা আছে। পাথরের কি কাঠের তা' বুঝা গেল না। ঢুকেই একেবারে সোজা পথ চলে গিয়েছে দূরে মন্দির পর্য্যন্ত চমৎকার ফুলবাগানের ভিতর দিয়ে। আমরা ভিতরে ঢুকলাম। দ্বারে কোন প্রহরী নেই। সোজা মন্দিরের দিকে না গিয়ে ডানদিকে ফিরলেন আমার অধিকারী। সে পথে অল্প কতকটা গিয়ে চমৎকার উঁচু জমির উপর একখানি উঁচু প্রকাণ্ড গৃহ, তার চার দিকে বারান্দা। প্রায় দশটি ধাপ,—এক একটি প্রায় এক ফুট করে ধাপ উঠে প্রশস্ত বারান্দায় পৌঁছে তিনি আমায়

সেখানেই বসতে ইঙ্গিত করে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন। ঘরের দ্বার নেই, ভিতরে আলো আছে, কিন্তু কি রকম আলো দেখতে পেলাম না।

সেখানে বেশীক্ষণ বসতে হয়নি। কত কি চিন্তা, বিস্ময়কর অনুভূতি চলছিল মনের মধ্যে। এমনই যখন চলেছে একটি কোমলা নারীকণ্ঠের ধ্বনি কানে যেতেই ফিরে দেখি পিছনে এক অপূর্ব্ব নারীমূর্ত্তি সেই স্থান আলো করে। প্রতিমার মতই স্থির। আমায় যেন কিছু বল্‌ছেন। এই আকস্মিক ব্যাপারে আমি যন্ত্রের মতই দাঁড়িয়ে উঠে জিজ্ঞাসুভাবে তাঁর মুখের দিকে দেখতেই তিনি যেন মৃদু হেসে আমার হাত ধরে আকর্ষণ করলেন।

পোষাক তাঁর অতি অদ্ভুত আর সুন্দর। বুকের উপর অন্য আবরণ নেই, কেবল গলা থেকে কয়েক গাছি হার ও মালা নেমে এসে বুকের উপর পড়েছে। নীচে কোমর থেকে ঝুলছে ঘাগরার মতই একটা কিছু হাঁটু পর্য্যন্ত। উপর হাতে অলঙ্কার একটি, নীচে তার ঝুম্‌কো। নীচের হাতে মণিবন্ধে কাঁকন আর চুড়ির মত কয়েক গাছি, অপরূপ গঠন তার, আগে এমন দেখিনি।

আমায় নিয়ে তিনি ঢুকলেন সেই ঘরে এক কোণে একটা ঝোলা শিকের মত তাইতে একটা ঝক্‌ঝকে প্রদীপ জ্বল্‌চে। সে প্রদীপ তেলের নয়, আর তার আলো লালচে নয়, নীলের আভা আর শুভ্র রশ্মি,—খুব তীব্র বা জোর নয়। আলোতে সে স্থানের সব কিছুই বেশ পরিষ্কার দেখা যায়। কাছাকাছি একটা আসন পাতা, তারই সুমুখে প্রকাণ্ড পদ্মপাতার উপর বড় বড় রুটির মত দু'তিনখানি,—আরও সব কিছু কিছু রাখা আছে। আর কিছু না বলেই প্রসন্ন বদনে আমায় প্রথমে সেই পিঁড়ির উপর দাঁড় করিয়ে দিলেন। তারপর আমার মাথার ক্যাপ ও পাগড়ি, তারপর ওপরের মোটা ওভার-কোট খুলে দেয়ালের একটি গোঁজায় ঝুলিয়ে দিলেন। আবার এসে ভিতরের তুলা ভরা জামা, তার নীচের ফ্লানেলের জামা, পট্টুর ফতুয়া, টুইল সার্ট, তার নীচের পুরা হাতা গেঞ্জিটাও খুলে রেখে দিলেন। তারপর পায়ের পাটি, নীচে মোজা সব কিছু খোলা আর রাখা হলে গায়ে একখানি পাতলা উত্তরীয় বাঁকা বেড় দিয়ে ঝুলিয়ে দিলেন, তাঁর এসব কাজে প্রতিবাদের ভাষা আমার জোগাল না। তারপর আমায় বসিয়ে দিয়ে ডান হাতটি ধরে করতলে পাত্র থেকে একটু জল ঢেলে দিলেন। আমি হাতটি ধুয়ে পাশে সেই হাত ধোয়া জলটি ফেলে দিলাম। তখন আমার খেতে ইঙ্গিত করলেন নিজের মুখের কাছে হাত তুলে। প্রথম থেকেই আমি মুগ্ধবৎ স্থির বাদ প্রতিবাদের ভাষাহীন মূক হয়েছিলাম। ভাষা আমার যোগায় নি এমন অবস্থা পূর্ব্বে আমার কখনও হয়নি।

এই যে ব্যাপার ঘট্‌লো অভাবনীয়, জীবনে কখনও এমন ঘটেনি। বিস্ময়তো ছিলই, তা' ছাড়া এমন একটি দেবী প্রতিমা যখন আমার হাতে ধরলেন, আমার মধ্যে

কোন প্রকার চাঞ্চল্য যে হল না এটি লক্ষ্য করে আমি মনে মনে কম আশ্চর্য্য হইনি। কি করে যে আমার চিত্তের মধ্যে চাঞ্চল্য আসেনি তা' এখনও আমার কাছে অজ্ঞাত। তবে সেটা যে আমার গুণে নয়, তা' খুব ভাল মতেই বুঝেছিলাম। যে যতটা সাধু, নিজের মনের কাছে তা 'ত অজানা নয়?

যাই হোক, ভোজনে বসতেই তিনি সরে গেলেন। যা খেলাম তার তুলনা নেই,—বোধ হয় সবই নিরামিষ উপকরণ। বোধ হয় বলছি এই কারণে প্রত্যেকটাই আমার অপরিচিত আর অতীব সুস্বাদু। রুটি বলে যেটি দেখেছিলাম তা' রুটির আকার মাত্র, বস্তুতঃ তা' অন্য জিনিষ, তার মধ্যে কেবল মাখনের গন্ধটুকুই আমার পরিচিত। আহার শেষে আমি দাঁড়ালাম। তৎক্ষণাৎ তিনি এলেন—আবার আমার হাত ধরলেন, ধরে বাহিরে বারান্দায় প্রথমে যেখানে বসেছিলাম সেইখানে এনে এক পরিষ্কার শয্যায় বসিয়ে দিলেন, ইতিমধ্যে এখানে শয্যা রচনা করা হয়েছে বুঝলাম। আমায় শোবার ইঙ্গিত করে তিনি চলে গেলেন।

শয্যায় বসেছি,—বিস্ময়ের পর বিস্ময় চলেছে আজ সেই তুষার-প্রান্তরে দেবমূর্ত্তির সঙ্গে যোগাযোগের পর থেকেই,—সে বিস্ময়ের ধারা চলেছে একটার পর একটা ব্যাপারে, দৃশ্যে, ব্যবহারে—এখনও তার ঘোর কাটেনি—। অনুভব করছি যেন সারাদিনের ক্লান্তি এসে আমার চক্ষে জমে উঠেছে,—আমি আর বেশীক্ষণ বসে থাকতে পারলাম না, কখন যে শুয়ে পড়েছি কিছুই মনে নেই।

তিন

একটা পাখীর অপরূপ কণ্ঠের স্বরের সঙ্গে সঙ্গে আমার জাগরণ এই স্বর্গরাজ্যে। স্বর্গ ছাড়া আমি আর কিছুই ভাবতে পারি না এদেশের সব কিছু। উঠেই আমি সম্পূর্ণ শক্তিমান, সর্ব্বরকমেই আনন্দময় মনের অনুভব নিয়ে, দাঁড়ালাম। তারপর সেই স্থান থেকে নেমে বাগানের যে পথ দিয়ে এখানে এসেছি, সেই সরল পথে নদী তীরে উপস্থিত হলাম,—তখনও বেশী আলো হয় হয়নি। প্রাতঃকৃত্য সেরে নদীর তীরে এসে একটু বসেছি। তীরে যে মাটি তাও পাথরের মত। কাছাকাছি গাছপালা আছে, বিশাল ঝাউ গাছ, ইউক্যালিপ্টাসের মত এক রকম গাছ,—লম্বা তালগাছের মত, কিন্তু তাল নয় অন্য গাছ,—আবার ছোট গাছও আছে, সব ঐ পাথর বা মাটির উপরই জন্মেছে। দূরে আবছা দেখা গেল যেন দু' তিন জন লোক, গায়ের উত্তরীয় তীরে ফেলে শুধু কৌপীন পরে জলে নামলো। আমারও স্নান করিবার ইচ্ছা, কিন্তু ভিতরে কৌপীন নাই—কি করব তাই ভাবছিলাম বসে।

আমার কাছ থেকে অল্প দূরেই একটি সুন্দরী এসে কোন দিকে না চেয়ে কটি থেকে খাটো ঝোলায়মান ঘাগরাটি খুলে রেখেই জলে নামলো। যেটুকু সঙ্কোচ তখন কেটে

গেল, আমি কাপড়খানি খুলে রেখে জলে নামলাম ;—অবশ্য ঠিক সেখানেই নয়,—মেয়েটির কাছ থেকে বেশ থানিক দূরে গিয়ে।

বরফের মত ঠাণ্ডা জল, কাঁচের মত স্বচ্ছ ঈষৎ নীলাভ। আস্বাদনে একটা মিষ্টতা আছে। ক্রমে বেশ আলো হয়ে আসছে ;—সেই আলোয় গাছপালার রং ক্রমশঃই ফুটতে লাগলো।

এক কথায় যত প্রকার রং হতে পারে সব রকম রংই আছে এখানে বৃক্ষরাজ্যে, এ রঙের ব্যাখ্যা ভাষায় কখনও সম্ভব হবে না। এখানকার গাছ বা ফুলের বিস্তৃত বর্ণনা করতে গেলে একখানি পৃথক গ্রন্থ হয়ে যাবে।

স্নান করে উঠে কাপড় পরে ধীরে ধীরে পথের দু'দিকে ছোট বড় গাছ আর ফুলের বাহার দেখতে দেখতে সেই তোরণের পথে এগিয়ে চললাম।

সোজা গিয়ে সেই ঘরের বারান্দায় উঠলাম। আগেই বলেছি,—এখানকার ঘর বাড়ী তোরণ সবই ঐ মাটি বা পাথরের, এমন কি ছাদ পর্য্যন্ত।—কিন্তু তা' কোথাও মসৃণ নয়, তবে চোস্ত, আর তুষার বর্ণ। মনে হয় যেন তুষার দিয়েই সব কিছু তৈরী,—বোধ হয় মাটির রং ঐ রকম। সেই বারান্দায় গিয়ে দেখলাম যে শয্যা নেই, তার জায়গায় একখানি উঁচু কাঠের আসন, সেখানে না বসে সুমুখের সেই বড় ঘরখানি যেখানে রাত্রে বসে ভোজন করেছিলাম সেই ঘরখানির দ্বার পথে গিয়ে দাঁড়ালাম,—ঢুকবো কিনা ভাবছি। ঘরের ভিতর আলো, দিনের আলোয় আলোকিত। সুমুখে দেখলাম অনেকটা লম্বা মঞ্চের মত,—তার উপরে নানা প্রকার জিনিষ গোছানো পরিপাটি রাখা আছে। তার মধ্যে শাঁক আর চূড়াযুক্ত কৌটা, এই দু'টি আকর্ষণ করে। এমন শাঁক কখনও দেখিনি। এক হাত লম্বা, মুখের দিকটা সরু—উপর দিকে তার সারি সারি চার পাঁচটি পল। রং উজ্জ্বল সিন্দুর,—মুখটি তার সোনা দিয়ে বাঁধানো।

ঠিক তার নীচে একটি লম্বা চৌকী, সারা দেয়াল জুড়েই রাখা আছে, একখানি চিত্রিত চামড়ায় ঢাকা। তার উপর সোনার কয়েকটি ব্যবহারের জিনিষ। ঘণ্টার মত একটি প্রায় এক হাত উঁচু মধ্যস্থলে রাখা। দেখছি, আর ভিতরে যাবার জন্য একটা আকর্ষণ অন্তরে অনুভব করছি। এমন সময় সেই মূর্ত্তি, আমায় যিনি এখানে এনেছেন, আর তাঁর পিছনে সেই দেবী, যিনি আমার সৎকার করেছিলেন, তাঁরা হাসতে হাসতে দু'জনের দু'দিকে এসে আমার হাত ধরলেন, আর অপরূপ ভাষায় কি বললেন। ভাষা বুঝলাম না, কিন্তু তার মধ্যে মিত্র শব্দটি বুঝলাম। যেন ভাবার্থ তার এই যে, হে মিত্র তুমি বাইরে দাঁড়িয়ে কেন, ভিতরে এস। বলে, আমায় ভিতরে নিয়ে গেলেন। আমরা সেই চৌকীর সুমুখে দাঁড়ালেম। তারপর তাঁর সঙ্গিনীকে কি বল্লেন তাইতে তিনি আমার হাত ছেড়ে দিয়ে অন্য দিকে চলে গেলেন।

এখন দেখলাম সেই উজ্জ্বল গৌরবর্ণ পুরুষমূর্ত্তির বেশ অন্য রকম। মাথায় মুকুট নাই,—ঘন কালো চুল কাঁধ অবধি ঝুলচে। গলায় তিন শুর হার। প্রত্যেক হারের নীচে বুকের উপর ঝুলছে একটি করে রত্ন। প্রত্যেক হার সোনার বটে, কিন্তু গিনি সোনার মত নয়, সোনার রং এরকম উজ্জ্বল সিন্দুরের আভাযুক্ত হয় কখনও কোথাও আগে দেখিনি। উপর হাতে সোনার কেয়ুর—মাঝে মাঝে রত্ন বসানো তার নীচে চতুষ্কোণ কবচ। নীচের হাতে বালা, সেই প্রশস্ত বুকের উপর বাঁ কাঁধ বেড় দিয়ে চামড়ার চওড়া পট্টি, তাতে সোনালী কারুকার্য্য, নীচে কোমরবন্ধনের সঙ্গে বাঁধা। উত্তরীয় নেই। বুঝলাম মুকুট ও উত্তরীয় বাইরের পোষাক। এখন কেবল কোমরের নীচে থেকে হাঁটু পর্য্যন্ত ঢাকা বিচিত্র লাল রংয়ের মোটা কাপড়ে—সোনালী রেখায় রেখায় ভরা। পায়ে কিছু নেই।

সেই দেবীমূর্ত্তির বেশ এবং ভূষা প্রায়ই এই রকম। মাথায় ঘন চুলের বেণী, নানা রংয়ের ফুলের সঙ্গে বিনুনী করে বাঁধা পিঠে ঝলছে। কানে নীল রত্নকুণ্ডল দুলছে কপালে ছোট চাঁদ একখানি। গলায় এক রকমই সোনার হার সাতনর, বুকের উপর গোলাকার রত্নমণ্ডিত পদক ঝুলছে কোমর পর্য্যন্ত। বুকে কোনও বস্ত্র বা অন্য আভরণ নেই। ডমরু মধ্যকটির বর্ণনা পড়েছি, এখন চাক্ষুষ দেখলাম। মুক্তা ঝালরের কোটি বেড়া, তার নীচে উজ্জ্বল নীল বস্ত্র হাঁটু অবধি ঝুলছে, - নীচের দিকে বড় বড় সোনার ঝালর, চলনের সঙ্গে সঙ্গে এক এক দিকে চমকে উঠছে। তল পায়ে কিছু নেই বটে, তবে গোছের উপর তিনটি সোনার বিচিত্র গড়নের পটী,—ঘুঙ্গুর কি নূপুর নয়। রূপের বর্ণনায় কাজ নাই দেবী বলতে যে রূপ কল্পনা করি বোধ হয় এ তাই।

যাই হোক, এখন চৌকীর উপরে দেখতে দেখতে সেই ঘণ্টার কাছে দেখি, কাল তিনি বরফ খুঁড়ে যেগুলি বুকের মধ্যে রেখেছিলেন, সেইগুলি রাখা আছে নীল রংয়ের একখানি রেকাবের মত পাত্রে। দেখেই আমি একটা তুলে তাঁকে হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করলাম, "এ কি বস্তু তিনি মৃদু হেসে তাঁর ভাষায় যা' বললেন, তার মর্ম্মার্থ এই বুঝলাম, যেন আমায় বললেন, ওটা তুমি নাও, ওটা আর ওর মধ্যে রেখো না। তারপর আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন যে, অতি অল্প তিল পরিমাণ এই বস্তু দুগ্ধের সঙ্গে যদি খাওয়া যায় শরীরের ওজধাতুর বৃদ্ধি হয় কোন প্রকারেরই শরীরের ক্ষয় হয় না, এতে মানুষ শতায়ু হতে পারে। এর নাম তুষার গোঠল।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ কি আপনারা নিত্য ব্যবহার করেন? কি ভাবে করেন?

তিনি কিছু না বলে সেই চৌকীর উপর যে মন্দির চূড়ার মত ঢাকন, সোনার কৌটা রাখা ছিল সেটি তুলে নিলেন। ডালা খুলে দেখালেন তার মধ্যে শ্বেতবর্ণ চূর্ণ। তার মধ্যে একটি ছোট সোনার চামচের মত আছে, সেই চূর্ণ এক পূর্ণ চামচ তুলে আমার

মাথাটি ধরে মুখে ঢেলে দিলেন। ঠিক সেই সময় দেবী মূর্ত্তি রূপার পাত্রে পীতবর্ণ ঘন দুধ নিয়ে এলেন এবং সেইটি আমায় পানের জন্যে হাতে তুলে দিলেন। আমি পান করলাম, তার মধ্যে কেশর বা কুঙ্কুমের সঙ্গে মৃগনাভীর গন্ধ, অমৃতের মত স্বাদ তার। অল্প ক্ষণেই প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তার শক্তি অনুভব করলাম।

যাই হোক, সেই চৌকী দু'টির উপর নানা প্রকার আশ্চর্য্য, অপূর্ব্ব বস্তু কত যে দেখলাম তা' বলে শেষ করা যায় না। সেই ঘরের দেয়ালে নানা প্রকার বর্ম্ম, চর্ম্ম, কিরীট, খড়্গ, খেটক, কত রকমের অলঙ্কার ঝোলানো আছে। দেব মিত্র আমায় সেই সব দেখিয়ে যেন কোমল গম্ভীর কণ্ঠে কাকে ডাকলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রসন্ন বদনে সেই দেবীমূর্ত্তির আবির্ভাব। তিনি তাঁকে আবার কিছু বলে আমার হাত দু'টি ধরে বিদায় নেবার ভঙ্গিতে তাঁর সেই দেবভাষায় কিছু বললেন, বোধ হল তিনি এখন প্রয়োজনীয় কোন কাজে, সমিতিতে বা মণ্ডলে যাবেন, তাই এ দেবীই আমার সৎকার করবেন,—তিনি থাকতে পারবেন না। তাঁদের কথায় মনে হয় ভাষা নিশ্চিৎ সংস্কৃত শব্দবহুল। তার মধ্যে মিত্র, পতি, মণ্ডল, সমিতি, প্রধান, সৎকার এই কথাগুলি শুনেছিলাম তিনি বেরিয়ে যেতেই আমরাও বেরিয়ে বারান্দায় এলাম।

চার

তারপর আমরা সেই তোরণের দিকে এসে ডান দিক ঘুরে, পড়লাম সেই প্রশস্ত মন্দিরের পথে। এই পথের শোভা আর সম্পদ বর্ণনার ভাষা নেই। কেবল এইটুকু বলব যে, দু'ধারে একটু তফাতে তফাতে বড় বড় গাছ আর দুই বড় গাছের ব্যবধানে ছোট ছোট ফুলের গাছ। আবার মাঝে মাঝে লম্বা চতুষ্কোণ বেদীর মত, তার চারিদিকে দশ বারোটি করে আসন। এই পথ প্রায় এক মাইল, বিশাল মন্দির প্রাঙ্গণেই শেষ হয়েছে। ঠিক যেন সাঞ্চির স্তূপ, কেবল একটু আরও বেশী উঁচু,—আর মাথায় সোনার কলস সাতটি; নীচের দিক থেকে, বড় থেকে ক্রমে সব উঁচুতে শেষেরটি ছোট,—তার উপরে দণ্ড একটি তার মাথায় ত্রিশূল। ত্রিশূলের নীচেই শুক্লবর্ণ একটা কিছু চিহ্ন আছে যা' অতটা নীচে থেকে দেখা গেল না। শৈব চিহ্ন দেখে মনে হোলো এটি শিব মন্দির আর এ ক্ষেত্রও শিবের।

প্রত্যেকটি এক ফুটের কম নয়, পথ থেকে ত্রিশ বত্রিশটি ধাপ উঠে মন্দিরতলে পৌছতে হয়। আমার দেবী-সঙ্গিনী প্রথমে প্রাঙ্গণ থেকেই একবার চারদিক পরিক্রম করিয়ে সকল কিছুই দেখিয়ে দিলেন নীচের তলে যা' কিছু দেখবার ছিল। বড় বড় গুহা, খুব লম্বা, প্রত্যেকটি প্রচুর আলোকে আলোকিত। কোনটিতে অসংখ্য প্রকারের তৈজসপত্র, কোনটি নানাবিধ ব্যবহার্য্য দ্রব্যে পূর্ণ, কোনটি অস্ত্রশস্ত্রে পরিপূর্ণ, কোথাও

রন্ধনশালা। দশ বারোজন ভীম দর্শন পাচক নিজকার্য্যে মনোযোগী। তার পাশেই নানাপ্রকার ফল, মূল, মিষ্টান্ন স্তূপাকার পৃথক পৃথক মঞ্চে রাখা আছে—সে রাখারও সৌন্দর্য্য আছে, দাঁড়িয়ে শুধু দেখতেই ইচ্ছা নয়, লোভও হয়। ধূপ, চন্দন, কস্তুমের গন্ধ মিলিয়ে এক অপূর্ব্ব গন্ধ চারিদিক, বোধ হয় সারা পথটি আমোদিত করেছে। নীচে প্রদক্ষিণ শেষ হতে প্রায় দেড় ঘণ্টা কেটে গেল। এত বড় বিস্তার জীবনে কোন মন্দিরেই দেখিনি। স্বদেশেত নয়ই, বিদেশেও নয়। যাই হোক, এবার আমরা উপরে উঠলাম। বেশী লোক নেই মোটেই।

উঠেই প্রশস্ত বারান্দা, আশী নব্বুই হাত লম্বা একদিক,—চারদিকেই ঐরকম যেহেতু মন্দির-ক্ষেত্র সমচতুষ্কোণ। বারান্দা থেকে সোজা নাট-মন্দির দিয়ে মন্দির দ্বার খুব কম করে একশ' কি সওয়া শো হাত হবে। এই বিরাট নাট-মন্দিরের মধ্যে স্থাপত্য সরল, চিত্রই এখানকার প্রধান আকর্ষণ। এক কথায় এই নাট-মন্দিরটি যেন একটি ইন্দ্রসভা। আমি সংক্ষেপেই এখন সব বাইরের যা কিছু দেখেছি তা বোলেছি,—এবার মন্দিরের কথা।

আসল মন্দির বিশালয়তন,—চক্রাকার—পঞ্চাশ থেকে ষাট হাত হবে ভিতরের ব্যাস। প্রবেশ দ্বারে কপাট নাই যদিও একদিকে একটি মাত্র দ্বার। দুইদিকে দুইটি স্বর্ণ নির্ম্মিত বিশাল খোদিত কলস,—আমাদের দেশের গাড়ুর মতই তার আকার,কেবল নল নেই। মন্দিরাভ্যন্তর স্নিগ্ধ হরিৎ জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। সে জ্যোতি বা আলো কোন্ মুক্তস্থান বা বাতায়ন পথে বাইরে থেকে আসচে না। কারণ চক্রাকার মন্দিরের তল হতে সর্ব্বোচ্চ কেন্দ্রে, শতদল পদ্ম-চিত্রিত বিশাল স্তূপাকার স্থানের মধ্যে চন্দ্রাতপের নীচে পর্য্যন্ত কোথাও একটি ক্ষুদ্রতম ছিদ্রও নাই। ভিতরেই এমন কিছু আছে যার আভায় ভিতরের সর্ব্বস্থান আশ্চর্য্য আলোকিত। দেখলাম সুমুখেই সমচতুষ্কোণ প্রায় দশ ফুট উঁচু বেদী, ছয়টি ধাপ উঠে সেই প্রশস্ত বেদীর উপর পৌছাতে হয়.। সেই বেদীর উপর,—ঠিক মধ্যস্থলে নানা রত্ন অলঙ্কৃত উজ্জ্বল স্বর্ণময় আসন বা চৌকী। তার চারদিকে চারটি স্বর্ণময় দণ্ড—উপরে মণিমুক্তার ঝালর ঘেরা চন্দ্রাতপ। তার উপরে রত্নময় বিশাল ছত্র ঝুলছে। কেন্দ্রের সেই শতদল পদ্মের কেন্দ্র থেকে রূপার শিকলেই সেই ছত্রের কেন্দ্রস্থ আংটীর সঙ্গে বাঁধা।

সঙ্গিনী আমায় নিয়ে ভিতরে গিয়ে ছয়টি সোপান পেরিয়ে সেই হেম সিংহাসনের সুমুখে দাঁড়ালেন। বিস্ময়ের উপর বিস্ময়ের প্রবাহ চলছিল আমার অন্তঃকরণে। তার চরম হল এইবার যখন দেখলাম সেই রত্ন আসনের মাঝে একখানি ছোট একহাত সমচতুষ্কোণ আধার,—সেটি অতীব উজ্জ্বল পীতবর্ণ বস্ত্রমণ্ডিত। তার উপর, ঠিক কেন্দ্রস্থলে এক অপূর্ব্ব বস্তু। সেটি এমনই তীব্র জ্যোতির্ম্ময় যে, প্রথমে কিছুক্ষণ ভাল দেখতে বা

বুঝতে পারিনি সেটা কি পদার্থ। শেষে যখন প্রকৃতিস্থ হলাম তখন নিরীক্ষণ করলাম একটি বুড়ো আঙ্গুল যতো বড় ঠিক ততটাই পরিমাণ বজ্রমণিময় বুদ্ধমূর্ত্তি আর ঠিক তার পিছনে কিছু কম এক বিঘৎ পরিমিত একটি মরকত মণিময় বৃক্ষ। এই দুই রত্নময় পদার্থ তারই জ্যোতিতে এই মন্দির অভ্যন্তর উদ্ভাসিত।

বিস্ময় আর আনন্দ ঘনীভূত হয়ে আমার মধ্যে সংজ্ঞালোপের অবস্থা হয়েছিল, অনেকক্ষণ স্থির করতে পারিনি, আমি কোথায় আর কি দেখছি। সেই উজ্জ্বল হীরক খণ্ড যা' ভগবান বুদ্ধের ধ্যানমূর্ত্তিতে পরিণত হয়েছে আর তার পিছনে যে পান্নার গাছটি এই দুই আশ্চর্য্য রত্নের মিলিত জ্যোতিঃ সেই মন্দিরের গর্ভ-গৃহটি সুরলোকে পরিণত করেছে। তার প্রভাব যে কতটা, ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। কিন্তু আমার বিস্ময় স্তম্ভিত-চিত্ত এই দুই বস্তু মানুষের সৃষ্টি বলে বিশ্বাস করতেই পারেনি। দেবী প্রথম থেকেই আমার বিস্ময়াবিষ্ট ভাব লক্ষ্য করছিলেন, এখন তাঁর দিকে লক্ষ্য করতেই, একটু হেসেই তিনি সাহস দিলেন। তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ বস্তু কি, আর কি ভাবে হেথা এসেছে জানতে কৌতূহল হয়। হিন্দীতেই বলেছিলাম।

মৃদু হেসে তিনি যে সকল কথা বললেন তার মর্ম্মার্থ এই ;—মরকত মণিময় বৃক্ষটি, কত কালের তা' কেউ জানে না, তবে ঐ বস্তু মানুষের হাতে তৈরী নয়, হিমালয়ের যেখানে ঐ মণির আকর সেখান থেকেই ঐ ভাবে ঠিক ঐ অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল,—রতলের রাজার কাছে ছিল। বজ্রসেনের প্রপিতামহ তাঁকে যুদ্ধে হারিয়ে তাঁর রাজ্য জয় করে ওটি নিয়ে আসেন অন্যান্য রত্নের সঙ্গে। ঐ মরকত মণির শক্তি ছিল অসীম ; দৈব শক্তি বলেই আমরা জানি। ঐ রত্নের প্রভাবে তিনি করডের রাজ্য জয় করে এইখানে এই মন্দির স্থাপন করেন, আর এই মন্দিরটি কেন্দ্র করে তাঁর রাজধানীর আয়তন চারিদিকেই বিস্তৃত করেছিলেন। তার পরে তাঁর এই রাজ্যের নাম মরকত রাজ্য বোলে ঘোষণা করেছিলেন, সেই অবধি এটি মরকত রাজ্য বলেই পরিচিত হয়ে আসচে যদিও এটা করড রাজ্য। বজ্রমণির ঐ মূর্ত্তিটি পরে কিম্পুরুষ বর্ষ (তিব্বত) থেকে একজন এখানে এনেছিল। দুই পারট সোনার গুঁড়া আর দুই সহস্র অশ্বের বিনিময়ে গন্ধর্ব্ব যুবরাজ কনকবজ্র ঐ মূর্ত্তি গ্রহণ করে নিজ রত্নাগারে রেখেছিলেন। রাজপুরোহিত বালকাশ্যপ্ ওটি দেখে বলেছিলেন যে, ও বস্তু রত্নাগারে রাখবার নয়, এই মন্দিরই এর উপযুক্ত স্থান। তখন রাজা ঐটি এখানে এনে মরকত দ্রুমের তলে স্থাপন করেন। যতদিন ঐ দু'টি রত্ন পৃথক ছিল ততদিন কোনটি থেকেই এমন জ্যোতিঃ বিকীরণ হতোনা ;—যেই মাত্র ঐ দু'টি রত্ন একত্র হলো, মহা আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটলো, সঙ্গে সঙ্গে এমনই জ্যোতিঃ বেরিয়ে মন্দির আলোকিত হয়ে উঠলো, আর তখন থেকে

কোন দীপ রাখা হয় না। এই কথা বলে দেবী আমায় সিংহাসনের আরও নিকটে নিয়ে গিয়ে বললেন,—দেখ, ভাল করে দেখ!

বজ্রমণিময় ধ্যানী বুদ্ধের পিছনে যে পান্নার গাছটি এক বিঘৎ উঁচু, চওড়ায় কিছু বেশী বোলেছি। মূল থেকে পাঁচটি ডাল উপর দিকে উঠে ঘন ঘন পত্রগুচ্ছের মধ্যে মিলিয়ে গিয়েছে। উপর দিক ছাতার মত ছড়ানো। আরও আশ্চর্য্য এই যে, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পাতার গুচ্ছ এমন স্বাভাবিক, অত অল্পটুকু পরিসর মধ্যে কেমন করে যে বিশাল একটি গাছের অত পরিষ্কার আয়তন সম্ভব হতে পেরেচে দেখলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়। সবচেয়ে আশ্চর্য্য এই যে, পায়রা মটরের মত ছোট ছোট রক্তবর্ণ মাণিক প্রত্যেক ডালের মাঝে মাঝে স্বাভাবিক ভাবেই সংযুক্ত। প্রকৃতির হাতে গড়া অপূর্ব্ব এই রত্নময় বৃক্ষ।

পাঁচ

আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা ক্লান্তি কিছুই ছিল না, অথচ তখন দেবীর কাছে শুনলাম বেলা আড়াই প্রহর উত্তীর্ণ হয়েছে। শরীরে একটা তেজ, শক্তি অনুভব করচি, আমি যেন অমরলোকের অধিবাসী। দেবী যেন বললেন, সন্ধ্যায় আমরা আবার এখানে আসবো এখন চল যাই। গর্ভগৃহ থেকে বেরিয়ে দেখি নাটমন্দিরে অনেক লোক আসা যাওয়া করচে, মধ্যে বিস্তৃত আসনে পাঁচ ছয়টি অপ্সরা মূর্ত্তি—নানাবিধ বাদ্যযন্ত্রে চারিধার সাজানো—পরম রূপবান যুবা কয়েকজন সে সকল যন্ত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন। তার মধ্যে একটি যন্ত্র নৌকার মত আধখানা যেন কাটা, তারের যন্ত্র, খুব দূর পর্য্যন্ত তার ধ্বনির গতি। ক্রমে নাটমন্দিরের শেষে এসে উপর দেয়ালের চিত্রগুলি দেখছি ;—এমন সময় শুভ্র নীলবর্ণ উজ্জ্বল শরীর এক মূর্ত্তি, – দিনের আলোয় দেখলাম, এখানে উজ্জ্বল উজ্জ্বল নানা বর্ণের মানুষই দেখছি,যার যে রংই হোক মনে হয় সকলকার বর্ণই স্বচ্ছ,—তার উপরকার গায়ের রং যেমনই হোক না কেন ভিতরের একটা আভা যেন ফুটে উঠচে উপর দিকে। এঁরদেহ বিবিধ স্বর্ণজড়িত রত্ন অলঙ্কার পূর্ণ, তাঁর বুকে সেই রকম চামড়ার উপর সোনার কারিগরী অতীব প্রশস্ত বাঁ কাঁধে উত্তরীয় কোমরবন্ধ পর্য্যন্ত, তার ডান হাতে দণ্ড,—রক্তবর্ণ চক্ষু, প্রায় সাত ফুট উঁচু, অন্য কোথাও এ মূর্ত্তি দেখলে ভয় উৎপন্ন করতো, এমনই এক বিশাল মূর্ত্তি, বারান্দার দিক থেকে নাটমন্দিরে প্রবেশ করলেন। দেখেই আমার পাশ থেকে দেবী একটু উৎসাহের সঙ্গেই যেন বলে উঠলেন,—দেবরাজ!

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইন্দ্র নাকি?

মৃদু হেসে দেবী বললেন,—না না ; এই মন্দিরের সচিব।

তৎক্ষণে দেবরাজ দেবীকে লক্ষ্য করে একেবারে হন হন করে কাছে এসে পড়লেন। দেবী সেই মূর্ত্তিকে সম্ভাষণ করলেন মৃদু হেসে, দেবরাজ তার পাল্টা জবাব দিলেন, সেই

বিশাল বাহু বেষ্টনে দেবীকে একেবারে বুকে তুলে নিয়ে, দুই গালে দুইটি চুম্বন করে। তারপর নামিয়ে দিয়ে পাশে আমায় লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসু নেত্রে দেবীর দিকে চাইলেন।

দেবী মৃদু হেসে পরম স্নেহভরে তাঁকে যা' বললেন তা' থেকে আমি এইটুকু উদ্ধার করতে পারলাম যে, আমার এখানকার পরিচয় হল,—হিমাচল,—দক্ষিণের,—ভারতবর্ষীয়,—আর্য্য একজন।

মন্দির হতে ফিরে এলাম এক অপূর্ব্ব জ্ঞানের স্পন্দন নিয়ে। ভারতবর্ষের উত্তর প্রান্তে তুষার রাজ্যের মধ্যে এই যে দেশটি, দেবস্থান বোলেই মনের মধ্যে আমার দৃঢ় প্রত্যয় হয়েছিল। এখন এখানকার আরও কিছু দেখবার জন্য দেবীর কাছে আদেশ প্রার্থনা করলাম। দেবী সোজাই আমাকে উত্তর দিক দেখিয়ে যেন বোললেন, তুমি আজ ঐদিকে যাও তাহলে অনেক কিছুই দেখতে পাবে।

আমার মধ্যে ক্লান্তি ছিল না, মনে একটা অসাধারণ উৎসাহ নিয়ে আমি বেরিয়ে পড়লাম। অসাধারণ কথাটা সত্য, কারণ আমার জীবনের এই ত্রিশ বৎসর জীবনের মধ্যে অন্তরে কখনও এতটা প্রবল উৎসাহ এবং নিজেকে এতটা শক্তিশালী অনুভব করিনি। যে পথটি আমাদের সামনে সোজা উত্তর দিকে চলে গিয়েছে সেই পথটা ধরে আমি বেরিয়ে পড়লাম। কতকটা গিয়ে দুই পাশেই বাগানের মত কতকটা স্থান, মধ্যে এক এক খানি গৃহ, তুষারের আচ্ছাদন, কিন্তু সেটা ঠিক তুষার নয়। কারণ এখানে শীত নেই তুষার আসবে কোথা থেকে? অথচ আমাদের দেশে যেমন সব বাড়ীতে চুণকাম করা হয় এ তাও নয়। স্নিগ্ধ ভাব একটা আছে ঐ তুষার বর্ণের সঙ্গে,—আর ঘরগুলির আকারও বিচিত্র, বাইরে থেকে দেখতে আমাদের দেশে যেমন ইটের পাঁজা হয় প্রায় সেই রকম। কেবল উপরে গোলাকার একটা কিছু আছে দেখতে গম্বুজের মত উপরটা। তার মধ্যে বেশ অনেকটা ঘরের আয়তন তবে দ্বার বা বাতায়ন কিছুই দেখলাম না। অন্ততঃ বাইরে থেকে কিছুই দেখা যায় না।

ছোট ছোট বাগান, আমাদের দেশের দুইবিঘা জমি যতটা, গৃহ সংযুক্ত প্রত্যেক বাগান ততটাই হবে, প্রবেশপথ এক একটি সুন্দর তোরণের ভিতর দিয়ে, অথচ বিশেষ সূক্ষ্ম কারুকার্য্য তাতে নেই কিন্তু এমনই সুন্দর তার গঠন দেখলে আকৃষ্ট করে। আমার মনের মধ্যে একটা কৌতুহল জেগে উঠলো, ওখানে থাকে কারা, ভাবতে ভাবতে চলছিলাম,—প্রথম উদ্যান পেরিয়ে দ্বিতীয়খানি অতিক্রম করবার পূর্ব্বেই দেখলাম তোরণ পথে, মাথায় চূড়া, কানে কুণ্ডল এবং গলায় হার একটি বালক, বয়স সাত আট বৎসর হতে পারে; হাতে তার সুন্দর এক বিঘৎ পরিমাণ দীর্ঘ, এক বুরুল স্থূল একটি বস্তু, সোনার মত রং একদিকে একটি মকরের মুখাকৃতি। ছেলেটির রূপের কথা আমি বিশেষ কিছুই বোলবো না কারণ সে স্বর্গীয় রূপের বর্ণনায় ভাষা চিরদিনই দুর্ব্বল;—

কেবল এইটুকুই বোলবো তার অঙ্গের আভা প্রথমেই আমাকে মুগ্ধ করে। ছেলেটি দৌড়ে পথে এসে দাঁড়ালো, অদূরে আমায় দেখে যেন স্তম্ভিত হয়েই রইলো কিছুক্ষণ, আমিও দাঁড়িয়ে দেখচি,—তখন সেই উদ্যানস্থ গৃহ হতে বেরিয়ে এলো এক বিশাল মূর্ত্তি, —কোমর হতে একখানি উজ্জল স্বর্ণাভ বস্ত্র ঝুলচে জানুদেশ পর্য্যন্ত, নগ্ন পদ কেবল সোনার ঘুঙুরের মত দুই তিনটি স্তর অলঙ্কার পায়ে গাঁঠের উপর পর্য্যন্ত জড়ানো, গলায় হার, উপর হাতে কবচ, নীচের হাতে বলয়। কাঁধে তার প্রকাণ্ড একটা যন্ত্র অথবা ঐ জাতীয় একটা কিছু তার একদিকে দীর্ঘ দণ্ড তার প্রান্তদেশ বাঁ হাতে মুষ্টিবদ্ধ, ডান হাতটি মুক্ত। তিনি বেরিয়ে এসে প্রথমে ঐ বালকটিকে কি প্রশ্ন করলেন। ভাষা তো বুঝলাম না, কেবল একটিমাত্র শব্দ তার মধ্যে আমার পরিচিত মনে হোলো, সেটি, প্রিয়তম। উত্তরে বালক যা বললে তাতে সেই মূর্ত্তি আমার দিকে লক্ষ্য করলেন;— তারপর আমার দিকে এগিয়ে এলেন,—সামনে এসে যেন একটা বিস্ময়কর তত্ত্বের মিমাংসা হয়ে গেল এমনভাবে উল্লাস প্রকাশ করলেন, তারপর ঐ বালককে সম্বোধন করে তিনি বোললেন তার মর্ম্মার্থ তখনই বুঝলাম না বটে;—বুঝলাম ক্ষণকাল পরে, যখন ঐ বীর মূর্ত্তি, যাঁকে দেখে আমার মনে হয়েছিল যেন হলায়ুধ মূর্ত্তিমান,—আমায় আর কিছু না বোলে একটু প্রসন্ন হাসিতে আমায় স্বাগত জানিয়ে চলে গেলেন নিজ পথে। তখন সেই বালকটি মৃদু মৃদু হাসতে হাসতে এগিয়ে এসে আমার হাত ধরে নিয়ে চললো সেই তোরণ পথে তাদের অপরূপ তুষার বর্ণ গৃহের দিকে। যেন আমি তাদের কতই পরিচিত।

গৃহদ্বারেই দেখা হোলো গৃহস্বামিনীর সঙ্গে,—যেন একটি দেবী, বয়স বোধ হয় কিছু বেশী হবে আমার প্রধান আশ্রয়দাত্রীর তুলনায়। আরও একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এঁর লাবণ্যের মধ্যে, তা নীলবর্ণাভায। যে সকল অলঙ্কার তাঁর বক্ষস্থল আবৃত করে আছে তার অধিকাংশই ঘোর নীলবর্ণের রত্ন। বালক এগিয়ে যেতে লাগলো আমি পিছনেই আছি, দেখতে দেখতে চলেছি অপরূপ গৃহসজ্জা। গৃহাভ্যন্তরে যে সকল বস্তু দেখলাম তার মধ্যে অধিকাংশই রজতশুভ্র এবং গৃহ ভিত্তিতে যে সকল অস্ত্র ঝোলানো আছে শোভাবর্দ্ধন ব্যতীত তাদের আর কোন ব্যবহার আছে বোলে মনে হোলো না: প্রাঙ্গণে জাঁতার মতই এক প্রকার গুরুভার যন্ত্র তার পাশেই একখানি শ্বেত চর্ম্ম আসন সেই আসনে একটি বালিকা বসে সেই জাঁতার হাতলে হাত রেখে কি করচে বুঝলাম না।

সেই বালকটি আমার সঙ্গেই রয়েচে হাত ধরে। এখন সে আমাকে তার মায়ের কাছে নিয়ে এসে বোধ হয় আমার কথাই বললে; তাতে জননী দেবী যা বোললেন তারপরেই বালক আমার হাতটি ধরলে তারপর টেনে নিয়ে চললো। সে ঘর পেরিয়ে অন্য একখানা প্রকাণ্ড ঘরের মধ্যে এসে সে আমার হাত ছেড়ে দিলে। দেখি

নানাবিধ দ্রব্যসম্ভারে সাজানো। একটা সুধা গন্ধ, প্রবেশমাত্র আমাকে পুলকিত করে তুললে। এটা কিসের গন্ধ, তা কিছুতেই বুঝতে পারিনি;—চারদিকেই দেখছিলাম। তিন দিকে, নানা রংয়ের চতুষ্কোণ আধার, ঘড়াঞ্চের মত দেখতে তারই উপর স্তরে স্তরে নানা আকারের সুন্দর দ্রব্য সাজানো রয়েছে। তারপর ঘরের চারটি কোণে, চারটি মাঝারী জালার মত, শ্বেতবর্ণ, গায়ে তাদের চমৎকার অলঙ্কার, খোদাই শিল্প-নিদর্শন;—একদিকে কলসি পিঁড়ির উপর অপূর্ব্ব আকারের পীতবর্ণের কলস উপরে প্রত্যেকটার চূড়াওয়ালা ঢাকন,—সেগুলিও শিল্পালঙ্কারে ভরা। আমার সহজেই ধারণা হয়ে গেল এটা ভাঁড়ার ঘর। এখানে যে দ্রব্যটি আমায় প্রথমেই আকর্ষণ করলে সেগুলি আমার সামনেই স্তরে স্তরে সাজিয়ে রাখাছিল একবুক উঁচু পিঁড়ির উপর; দেখতে ভারি সুন্দর, আকারে কোনটি চতুষ্কোণ কোনটি বাদামী কোনটি গোল কিন্তু কোনটাই আধ ইঞ্চির বেশী স্থূল নয় আর এক বিঘতের বেশী লম্বা নয় তবে তার মধ্যভাগ প্রায় এক ইঞ্চি স্থূল। দেখতে যেন স্বচ্ছ হালকা পীত আর খয়েরি রং-এর মেশামিশি। কোন কথা না বোলেই হাতে একটা তুলে নিলাম। বালক প্রসন্ন নয়নে দেখছিল। আমায় ঐ দ্রব্যটি তুলে নিতে দেখেই এক কোণে ঢাকনওয়ালা কলসের কাছে গেল, পাত্রসমষ্টি সাজানো যেখানে ছিল সেখান থেকে শ্বেতবর্ণ একটি বাটি নিয়ে ঐ কলস থেকে হাতা চুবিয়ে খানিক তরল পদার্থ সেই বাটিতে নিয়ে আমার কাছে এলো,—আমার হাত থেকে পরে সেটি নিয়ে একদিকে খানিক ভেঙ্গে বাটিকে দুধের মত ঘন তরল পদার্থের মধ্যে ফেলে দিলে তারপর সেটা সেখানে রেখে সেই বালক ক্ষিপ্র পদে গিয়ে একখানা চামচ নিয়ে এলো। স্ফূর্ত্তিতে বালকটি যেন চঞ্চল হয়ে উঠলো। অদ্ভুত ব্যাপার ইতিমধ্যে দেখলাম, সেটা ক্রমে ফুলতে লাগলো, আর নরম হতে হতে সেই পাত্রটা ভরে উঠলো, তখন সেই দেব বালক একটা চামচেতে সেই দ্রব্য আমার মুখের দিকে তুলে ধরলে। এইবার বুঝলাম ঘরে ঢুকেই যে গন্ধটা পেয়েছিলাম সেটা এই বস্তুটির সুধা গন্ধ—এখন মুখে পুরে দিলাম সবটাই চামচের মধ্যে যেটুকু ছিল। অমৃতের স্বাদ, মৃদু মিষ্টরস তার মধ্যে খুবই কম;—লবণ বা অম্ল রসের অস্তিত্বই নেই, সে এক অদ্ভুত রসের স্বাদ। বুঝলাম এটা কোন প্রিয় খাদ্যবস্তু। তার গন্ধসুধায় যেন ভরে যায় একজনের শরীর মন। গন্ধ কতগুলি আছে শরীরে তার ক্রিয়া, সে গন্ধ খাদ্যের মধ্যে থাকে। তা আমরা আমাদের প্রত্যেক খাদ্যের মধ্যেই পেয়ে থাকি,—তাইতেই খাদ্য রুচিকর হয়, যেমন শস্য উৎপন্ন কোনও খাদ্য অথবা ফলের গন্ধ, আম বা আপেল প্রভৃতি। গব্যরসযুক্ত আতপান্ন অথবা যেমন গমের আটার রুটি গরম গরম তাতে গাওয়া ঘি মাখানো, উপকরণ সঙ্গে খেতে যে গন্ধটা পাওয়া যায় তাতে খাদ্যটি রুচিকর ও তৃপ্তিকর হয়। তাছাড়া আর অন্য এক প্রকার গন্ধ আছে,—যা মনের উপর ক্রিয়া করে

যেমন ফুলের গন্ধ। এইভাবে গন্ধের মধ্যেও আমাদের নানা প্রকার উপভোগই আছে। আজ এখানে যে গন্ধ ও বস্তুর সঙ্গে পরিচয় ঘটলো নামটি তার শুনলাম নিরভাতিক। তাকে অমৃতের গন্ধ বোলেই আমার মনে হোলো।

এবারে সেখানে এলেন একটি সুন্দর অপরূপ লাবণ্যমণ্ডিত যুবা, তেইশ চব্বিশ বছরের মধ্যে বয়স কিন্তু শক্তিশালী পুরুষ। ঐ প্রকার কোমরে তারও ঝুলায়মান অলঙ্কার সংযুক্ত বস্ত্র উজ্জ্বল নীলবর্ণের কার্পাস অথবা পশমের তৈরী, ঝুলচে হাঁটু পর্য্যন্ত। গায়ে তার একখণ্ড উত্তরীয় পিছন দিকে ফেলা কণ্ঠবেষ্টন করে। বুকে হার, স্বর্ণযুক্ত মণিময় হার একটি তার মধ্যে বৃহৎ একখণ্ড রক্তবর্ণ মাণিকের সমাবেশ। অসাধারণ জ্যোতি তার। যেই মাত্র তাঁর আবির্ভাব বালকটির অন্তর্দ্ধান ঠিক যেন যুগপথ একই সঙ্গে ঘটলো। এই যুবামূর্ত্তি আমার হাতখানি ধরে বাইরের দিকে দেখিয়ে কি যেন কি বললেন। নৃত্য ও সঙ্গীত এ দুটি তার মধ্যে আছে। এই সঙ্গে সঙ্গে আমরা বাইরে যে পথে ভিতরে ঢুকেছিলাম সেই পথেই বাইরে এসে পড়লাম এবং সামনের পথে চলতে আরম্ভ করলাম। এই দেব সাথীর হাতে প্রায় দেড় হাত লম্বা এক বুরুল স্থূল, সোনা এবং বিচিত্র শিল্পাকারুসমৃদ্ধ একটি দণ্ড ছিল উপরে একটি চক্রধর সাপের মুণ্ড।

বেশ আনন্দেই আমরা চলছিলাম। কতকটা এগিয়ে যেতেই আমাদের বাঁ দিকে উদ্যানগৃহ থেকে বেরিয়ে এলো এক বিশালকায় রক্ত-বস্ত্রধারী এক মূর্ত্তি। তার পোষাক এখানকার মত ঠিক নয় কতক পার্থক্য যেটি প্রথমেই চক্ষে পড়ে সেটা তার পিঠে ঝুলচে দীর্ঘ বেণী। এখানকার যাঁরা তাঁদের চুল প্রায়ই চূড়াবাঁধা আর ঘরের বাইরে গেলে মুকুট কিম্বা শিরাভরণের মধ্যে ঢাকা। নারীদের বেণী নানা অলঙ্কার শোভিত পিঠে ঝোলে। এ মূর্ত্তির মাথায় কোন আবরণ নাই সেটা ছিল হাতে, অপর হাতে একটি দণ্ড। টুপীটা স্থূল বস্ত্রে প্রস্তুত আর রং তার মলিন ঘোর খয়েরী। তার অপর বৈশিষ্ট্য হোলো পায়ে আজানু বিচিত্র স্থূল পশম নির্ম্মিত বুট তার তলা প্রায় দুই বুরুল স্থূল।

ছয়

আর অন্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এই মহাশয়ের মুখখানি চতুষ্কোণ আর উঁচু হনুদ্বয়। তাকে এখানকার মানুষ নয় বোলেই ধারণা জন্মে দেয়। কারণ এখানকার মুখ আর্য্যবংশীয় সৌন্দর্য্যপূর্ণ--কোমল—এ মূর্ত্তি গৌরবর্ণ হলেও যেন কঠোর শ্রীহীন তামাটে, গাল আপেলের মত ঘোর রক্তাভ। এই প্রবীণ মূর্ত্তি হাসতে হাসতে বেরিয়ে এলেন, তার হাতে একটি দণ্ডবিশেষ। দেখা গেল সামনের দুটি দাঁত নেই, আর নেই গোঁফ দাড়ির কোন চিহ্ন। কাণে কুণ্ডল তার উপর মাকড়ি গলায় হার ও নানারকমের বড় বড় পুঁথির মালা অনেকগুলি, ঐ দীর্ঘ বক্ষস্থল ভরা, বাহুতে কবচ কেয়ুর নীচে হাতে বালা।

এই মূর্ত্তি দেখা মাত্রই আমার একটি পূর্ব্বে দেখা মূর্ত্তির কথা মনে পড়ে গেল। জানিনা আজকালকার দিনে কারো সে কথা মনে আছে কিনা। সেটা আমাদের বাল্য-কালের অথবা কৈশোরের স্মৃতি। মিনার্ভা থিয়েটারে গিরীশচন্দ্রের বিখ্যাত পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস অভিনয়, তাতে দানীবাবুর বৃহন্নলারূপে আবির্ভাব যিনি দেখেছেন তিনি হয়তো বুঝতে পারবেন এখানে আমি যেমূর্ত্তি বুঝাতে চাইছিলাম। ঠিক ঐ ধরণেরই মূর্ত্তিখানি আমার চক্ষের সম্মুখে, পৃষ্ঠে বেণীবিলম্বিত,—দীর্ঘকায় ঐ গৃহ-তোরণ পেরিয়ে পথে এসে দাঁড়ালেন। এমন কি তাঁর সঙ্গে আমার নবীন, দেব সাথীর হাত ধরাধরি করে দাঁড়ানো,—খানিক কথা কওয়া, তার হাবভাব সব কিছু নড়াচড়ার ধরণ সকল কিছুই আমায় বৃহন্নলাকে স্মরণ করিয়েছিল।

তবে এখানকার একটি বিষয়ে আমার প্রিয়তম পাঠককে সাবধান করে দিতে হবে। যে শ্রদ্ধা নিয়ে আমরা তখনকার দিনে ঐ সকল স্বর্গীয় অভিনেতার অভিনয় দেখেছি এবং এখনও জীবনের এই শেষ দিনের কাছাকাছি এসেও তাঁদের প্রতি যে শ্রদ্ধা ও ভক্তি পোষণ করি তার সঙ্গে বর্ত্তমানে এই পৃষ্ঠে বেণীবিলম্বিত মূর্ত্তির কোন সম্বন্ধই নেই;—সম্বন্ধ যেটুকু তা ঐ মূর্ত্তির বাহ্য বেশভূষা ও কতকটা চালচলনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এইটুকু মনে রাখলেই আমি কৃতজ্ঞ থাকবো।

এখন এই এক বেণীধর বিশালকায় পুরুষপ্রবর হেলতে দুলতে আমার সাথীর এক পাশে এক অদ্ভুত চালে চলতে লাগলেন। তিনজনের গতি বেশ সম্মিলিত ভাবেই আনন্দের যাত্রা বোলেই প্রকাশ পাচ্ছিল, মধ্যে ঐ আর্য্যমূর্ত্তি কথায় কথায় বেশ প্রফুল্ল করে তুলছিলেন বেণীধরকে যদিও আমি তার কিছুই বুঝতে পারিনি। এখনও ঐ পথের দুদিকেই উদ্যান বেষ্টিত গৃহই চলছিল। পরিষ্কার নীল আকাশ কোথাও একবিন্দু মেঘের চিহ্নও নেই। সেই সুন্দর দিনের প্রভাব, রৌদ্র আছে কিন্তু তাপ নেই। আমরা আনন্দেই চলেছি ঐ পথে।

এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি, বেণীধরের হাতে যে দণ্ডটি ছিল সেটার মুখে একটা চমৎকার উজ্জল সোনার আংটা আর তাতে আটকানো একটি ধবধবে সাদা মারবেলের মত গুলি সেটা গজদন্তেরও হতে পারে। সেই গোলকটি মনে হয় দৈবশক্তিসম্পন্ন। পথে একস্থানে দাঁড়িয়ে গেলেন বেণীধর, তারপর দণ্ড সুদ্ধ তাঁর হাতটি, আকাশের দিকে উচু করে বৃত্তাকারে ঘোরাতে লাগলেন,—কয়েকবার ঘোরাবার সঙ্গে সঙ্গেই উপরে আকাশে একটি বেশ বড় পাখি ঘুরতে ঘুরতে নেমে আসচে দেখলাম। ক্রমে সেই পাখি এসে বসলো বেণীধরের মাথার টুপীর উপর। পাখিটি দুধের মত সাদা, ঠোঁট নীল, চক্ষুও লাল আর কণ্ঠে হালকা নীলবর্ণের রেখা সমস্ত গলা বেষ্টন করে। তখন বেণীধর দাঁড়িয়ে গেলেন। তাকে মাথা থেকে হাতে তাঁর সেই দণ্ডের উপর নিয়ে এলেন। এইবার আমার সাথী

তাঁর হাতের রত্নময় দণ্ডটি বাড়িয়ে দিলেন তার দিকে, পাখী এলো তাঁর দণ্ডের উপরে। বোধ হয় বেণীধর এটা মোটেই আশা করেনি,—তখন সে তার দণ্ডটির প্রান্তদেশের সেই শ্বেতবর্ণ গোলকটি পাখির মাথার উপরে স্পর্শমাত্রই পাখিটা কাতর আর্ত্তনাদ করতে করতে উড়ে গেল। দেখে বেণীধর ঈষৎ হাসলেন, আমার সাথী কিন্তু গম্ভীর হয়ে গেলেন।

এই ঘটনার পরেই বোধ হয় দশবারো মিনিটের মধ্যেই আমার দেব সাথী অকস্মাৎ বেণীধরের হাতের দণ্ডপ্রান্তে যে ধবল গোলকটি ছিল, নিজ হাতের সেই ধাতুনির্ম্মিত দীর্ঘ দণ্ড দিয়ে সেই গোলকটার উপরে প্রবলভাবে একটা আঘাত করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই গোলক স্থানচ্যুত হয়ে পথের উপর পড়ে গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ তা তুলে নিয়ে নিজ হস্তে মুষ্টিবদ্ধ করে রাখলেন। এবার বেণীধর গম্ভীর হলেন। এখন দেখলাম দুজনেই চললেন, কিছুক্ষণ কোন কথা নেই। তারপর আমরা এসে পড়লাম এক অপূর্ব্ব বর্ণ বৈচিত্র্যে এবং বিশাল মহীরূহ সমৃদ্ধ বনভাগে। এটি বন কি উপবন তা বাইরে থেকে বলা কঠিন।

কাল সকালে সেই প্রবাহিনী তীরে যে রকম অদ্ভুত গাছ দেখেছিলাম, এখানেও সেই বিচিত্র সুন্দর আকার ও বর্ণের নানা প্রকার গাছ, দীর্ঘ পাইনের মতই স্তম্ভাকার কাণ্ড এক একটি বিচিত্র রেখায় অলঙ্কৃত। অর্দ্ধাংশ নগ্ন তার ডালপালা উপরের দিকেই। পত্রগুলি অনেকটা সোজা সোজা আম পাতার মতই কোঁকড়ানো নয় মোটেই তবে রক্তবর্ণ এক পিঠ, হালকা আকাশের নীল তার উপর দিকটা। সেই পাতাগুলির উপর ভাগ কোমল ভেলভেটের মতই—আর সকল গাছের ছালের উপরটা মসৃণ, চক্‌চক্ করছে কোথাও নীল, কোথাও বা বেগুনী, তবে খুবই হালকা, কোথাও গাঢ় রং-এর সমাবেশ নেই। সেই গাছের রূপ এমনই চিত্তাকর্ষক, দেখতে দেখতে চক্ষু জুড়িয়ে যায়, কেমন যেন একটা নেশা লাগে। তার তলায় যেন তুষারাচ্ছাদিত ভূমি, অথচ তুষারের সঙ্গে কোন সম্পর্কই নেই এ রাজ্যে। এমন উজ্জ্বল সাদা নয়ন স্নিগ্ধকর অথচ কঠিন পাথরের মতই শক্ত মাটির কল্পনাও কঠিন আমাদের পক্ষে। যাই হোক সাথী আমার মহানন্দে আমায় নিয়ে প্রবেশ করলেন ঐ উপবনের মধ্যে কতকটা চলে আমরা একটি সেতুর কাছে এসে পড়লাম। এখানে এসেই সেই বেণীধর একটু দ্রুতপদ সঞ্চারে চলে গেলেন ঐ সেতু পেরিয়ে আমার সাথীর আজ্ঞায়। ক্রমে দেখা গেল আমাদের সামনেই অপূর্ব্ব একটি স্রোত, ঘোর নীলবর্ণ জলরাশী খরতর বেগে চলেছে, তার পরেই চমৎকার এক উদ্যান,—সেই উদ্যানের মধ্যে বিচিত্র স্থাপত্যময় বিশাল এক প্রাসাদোপম অট্টালিকা দূরে দেখা গেল। সাথী কি একটা কথা আমায় বললেন তার মধ্যে মাত্র তিনটি শব্দ আমার পরিচিত, প্রথম একটি হোলো সঙ্কর্ষণ, দ্বিতীয়টি—দর্ভ, তৃতীয়টি—পরমেষ্ঠি।

সেই সেতুটি বলেছি, ধনুকাকৃতি, এপার হতে ওপার প্রায় ত্রিশ হাত হবে,—তার দুদিকেই আল অথবা রেলীং আছে, প্রায় একহাত উঁচু, সেটা বিচিত্র বর্ণ পুষ্প লতা ও পল্লবেই রচিত মনে হোলো। সেতুর উপরে এপার থেকে ওপার যে ধনুকাকৃতি পথ প্রায় চার হাত চওড়া এবং দুই প্রান্তে দুটি অতীব সুন্দর তোরণ। এমনই তোরণযুক্ত সেতুর গঠন পারিপাট্য, দেখলেই মুগ্ধ হতে হয়, ঐ সেতু নির্ম্মাতার অসাধারণ দক্ষতায়। দেব সাথীর মুখেই শুনলাম যে, ঐ স্থপতি দৈব শক্তি সম্পন্ন। তাঁর অস্তিত্বের সঙ্গে বিশ্বকর্ম্মার যোগাযোগ ছিল।

সাত

আমরা এবার ক্রমে ক্রমে সেই তোরণের কাছে পৌঁছে গেলাম। সাথী আমার হাতটি ধরে অপরূপ ধ্বনী, এক স্বর্গীয় রাগিণীর দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করলেন যা এই তোরণের মধ্যে পাদক্ষেপের পূর্ব্বে শুনা যায়নি। প্রথমে আমি সুরের কোন আভাষই পাইনি তারপর প্রথমে অতি ধীর এবং মৃদু তারপর যতই আমরা সেতুর উপর দিয়ে উদ্যানের দিকে যেতে লাগলাম সুর ততই স্পষ্ট হতে লাগলো। সেতুর অপর প্রান্তের তোরণ অতিক্রম করবার সঙ্গে সঙ্গে বীণার সঙ্গে কণ্ঠস্বরের সংযোগে অপূর্ব্ব সঙ্গীত আমাদের কর্ণগোচর হোলো এমন সুরের মাহাত্ম্য জীবনে প্রথম অনুভব করলাম। বাল্যাবধি আমি সংগীতভক্ত, নিজেও গান করে থাকি। যৌবনের প্রারম্ভেই ধ্রুপদ সঙ্গীত শিখতে আরম্ভ করি। সুতরাং রাগরাগিনীর রূপের সঙ্গে আমার কিছু কিছু পরিচয় ছিল। এখানে এই উদ্যানের মধ্যে এসে যে সুর এবং যে রাগরাগিনীর ছন্দময় ধ্বনী আমার মধ্যে প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করলে তা আমার জীবনে প্রথম। সর্ব্বশরীর দিয়েই অনুভব, বোধ হয় প্রথম ঐ সুর শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গেই আমার সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো জীবন্ত সুরের প্রভাবে। আমাদের পরিচিত কোন রাগ বা রাগিনীর আলাপ এটা নয় সম্পূর্ণ অপরিচিত এবং স্বর্গীয়, এর তাল বা ছন্দও অন্য প্রকার। সে এক অপূর্ব্ব সুরের খেলা আজ জীবনে প্রত্যক্ষ করলাম।

আমার ধারণা ছিল স্বর্গের সুরলহরী ঐ মন্দিরাকৃতি প্রাসাদ থেকেই আসচে কিন্তু তোরণ অতিক্রম করবার পরেই লক্ষ্য করলাম প্রাসাদ তো অনেকটাই দূরে রয়েচে অতো দূর থেকে কখনই এত স্পষ্ট এবং উজ্জ্বল স্বরধ্বনী কানে আসতেই পারে না,—অথচ মনে হচ্ছে বেশ নিকটেই কোথাও সুরের ঐ তরঙ্গ উৎপন্ন হচ্ছে। তখন সাথীকে প্রশ্ন করলাম। তিনি সামনেই অল্প ব্যবধানে এক যে বিশাল কুঞ্জবনের মত দেখা

যাচ্ছে ঐদিকটাই দেখালেন। যাই হোক আমরা সেই দিকেই চললাম বটে কিন্তু ক্রমে ক্রমে সুরের তরঙ্গ ক্ষীণ হয়ে আসতে লাগলো আমার কানে। আমি একটু দ্রুতই চলতে চাইছিলাম, সাথী আমার হাতটি ধরলেন। তিনি একটি কথা আমার কানের কাছে বোললেন, বুঝলাম তিনি আমায় সংযত হতে বললেন। আরও যা অনুভব করলাম তা এই যে, যতক্ষণ আমি ধীর সংযত পদে চলছিলাম ততক্ষণ ঐ সুর পরিষ্কার শুনতে পেয়েছিলাম, এখন এই সেতু অতিক্রম করবার পরেই আমার ঐস্থানে পৌছাতে আগ্রহের আতিশয্যে শরীরকে দ্রুত চালনার ফলেই সুরের প্রভাব ক্ষীণ হয়ে এসেছে। সাথীর উপদেশে আবার ধীর পাদক্ষেপের ফলে সুরের ধ্বনী স্পষ্ট আমার শ্রবণগোচরে এলো এবং আমায় পুলকিত করলে।

ক্রমে যখন সেই কুঞ্জবনের নিকটে এলাম তখন সাথী আমায় ধরে খুব ধীরে ধীরে পাদক্ষেপ করতে করতে চললেন। ক্রমে সাথীর সংযম আমার মধ্যে সংক্রামিত হয়ে যখন একমাত্রায় এলো আর তখনই সাবধানে ধীরে ধীরে সেই সুরতরঙ্গেও ছন্দে মিলিত হয়েই আমরা সেই বিশাল কুঞ্জ তোরণ অতিক্রম করে চললাম। বিচিত্র তরুলতা বেষ্টিত চক্রাকার বিস্তৃত ক্ষেত্র, সামনেই দেখলাম, ঠিক মধ্যস্থলে বিরাট এক বৃত্তাকার বেদীর মত, ছয় সাতটি সোপান উঠে ঐ বেদীর উপরে পৌছাতে হয়। উভয়েই চললাম সেদিকে। কাছে যেতে দেখি; বেদী যাকে বলেচি যেন প্রকাণ্ড একটি দ্বীপ তার উপরে চারিধারেই ছোট বড় নানা জাতীয় গাছের মধ্যে একটি তোরণও দেখা যাচ্ছে একদিকে। আমরা ঐদিকেই চলতে চলতে সেই বিশাল বেদীর নীচে সোপানের কাছে এলাম, এবং সেই ভাবে ধীর ছন্দে আমরা সাতটি সোপান অতিক্রম করে বেদীর উপরে এলাম। এখানেও ছোট বড় গাছের মাঝে মাঝে লতাপাতায় রচিত যে বেষ্টনী আছে তার চারদিকে চারটি তোরণ, লতা ও গুচ্ছ গুচ্ছ ফুলে পাতায় অতুলনীয় শোভাময়, তারই একটির মধ্যে প্রবেশ করলাম। বেদীর মধ্যে প্রবেশের পর আর বেদী দেখলাম না ;—তার পরিবর্ত্তে বিশালায়ত এক সভাতল—নীচে অবস্থিত। যে সাতটি ধাপ উঠে আমরা বেদীর উপর উঠলাম ঠিক সেইরূপ সাতটি ধাপ অবতরণ করেই নীচে সভামণ্ডপে পৌছাতে হয়। মুক্ত আকাশ তলে সভা, দূর ব্যবধানে চারিদিকেই সোপান বেষ্টিত,—কিন্তু সেই সভার মধ্যে অনেক মূর্ত্তি, স্ত্রীপুরুষ, বিচিত্র তাদের দেহাবরণ। অনেকগুলি বিচিত্র যন্ত্রও সেখানে যন্ত্রীদের হাতে বাজতে দেখলাম কিন্তু মৃদঙ্গ মাত্র একটি,—আর তার আকৃতিও আমাদের দেশী বা পরিচিত বাদ্যের মতও নয়। উপর থেকে আমার এইটুকুই নয়ন গোচর হোলো। আরও যেন দেখলাম চারিদিকেই কয়েকটি মূর্ত্তি,চক্রাকারে নৃত্যশীল সভার কেন্দ্রস্থলে। সাথী বরাবরই আমার হাতটি ধরেই আছেন ছাড়েননি পাছে তাল ভঙ্গ হয়। আমার মধ্যে প্রাণের ক্রিয়া তখন এমনই সংযত ছিল যাতে দুটি শরীর

এ বোধ পর্য্যন্ত পৃথকভাবে ছিল না। যাই হোক আবার সোপানাবতরণ হোলো। নিম্নতম সোপান ও নৃত্য সভার ব্যবধানে অনেকটা ক্ষেত্র, সে চক্রেও অনেকগুলি শ্রোতা বা দর্শক উপবিষ্ট দেখা গেল।

আমরা ধীরে ধীরে কোনভাবেই ছন্দোভঙ্গ না করে উপবেশন করলাম। তখন সাথী আমার হাত ছাড়লেন। তারপর আমার অবস্থান্তর ঘটলো, অবশ্য তা অল্পক্ষণের জন্যই। আমার মধ্যে কতক্ষণ যেন চেতনা লোপ হয়েছিল সঙ্গালোপ যাকে বলে,— সুষুপ্তিতে যেমন হয়। তারপর সব ঠিক হয়ে গেল। সেই আসনে বসে যা দেখলাম আর শুনলাম তা স্বপ্ন,—যদিও সকল মুহূর্ত্তেই আমি জাগ্রত ছিলাম।

আমাদের নাচে যেমন ঘুঙুরের শব্দই ছন্দের দ্যোতক আর তার শব্দও ঝম্ ঝম্ বা ছপ্ ছপ্ বা শপ্ শপ্ ছস্ ছস্ কত রকমের শব্দ হয় এখানে কিন্তু শব্দ বা ধ্বনী সেভাবেরই নয় আর পায়ে বাঁধা ঘুঙুরও দেখলাম না। দেবী বা গন্ধর্ব্ব নারীগণের পায়ে নুপুর আর সেই নূপুরের ধারে ধারে অতীব সুন্দর মধুর ধ্বনী উৎপন্নকারি কিছু সংযুক্ত আছে। পুরুষগণের অলঙ্কার পায়ের গোছের উপর থেকে কয়েকটি লাইনে বাঁধা, আর ধ্বনী তারও মধুর। একত্র বাঁধা দশটি সেতারের যে কোন একটি পরদা টিপে আঘাত করলে একসঙ্গে মিলিত ঐ দশটির যে ধ্বনী উঠে, আর যেমন রেশ থাকে এখানে এঁদের এই নৃত্যে ঘুঙুর বা নূপুর নিক্কনের নৃত্যে ছন্দের প্রত্যেক মাত্রায় সেই ধরণের রেশ উৎপন্ন করছিল।

আমরা মগ্ন ছিলাম সেই নাচের সঙ্গে অপরূপ সুর তালের মিলন বৈচিত্র্যের মধ্যে। স্ত্রীপুরুষ মিলিত এই নৃত্য, প্রথমে কেউ কারো অঙ্গ স্পর্শ করে নয়,—এমন ভঙ্গী তাদের প্রত্যেক স্ত্রীপুরুষ মিলিত নৃত্যে সে স্বর্গীয় ভাব বর্ণনার ভাষা নেই। লম্ফঝম্ফহীন, অপূর্ব্ব সংযত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চালনা, উর্দ্ধাঙ্গ ও নিম্নাঙ্গের প্রবাহ আকারে লীলায়ীত ভঙ্গী। কি দুটি হাতের রূপ, কটিদেশ পর্য্যন্ত কি অপরূপ ছন্দে সঞ্চালন; তাদের আঙ্গুলের বিচিত্র মুদ্রারচনায় নমনীয়তা। সুরের সঙ্গে তালের, আর তালের সঙ্গে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কি অপূর্ব্ব সঙ্গতিপূর্ণ নৃত্য। সেই তাদের ভঙ্গিমার আবেশে বোধ হয় দর্শকগণের মধ্যে কারো সমাহিত হতে বাকি ছিলনা। তারপর নিম্নাঙ্গের নৃত্য যা, তাও কম বৈচিত্র্যময় ছিলনা। আমার মনে হোলো আজকের এই উৎসব নৃত্য ও গীতের আয়োজন বিশেষ কোন পর্ব্ব অথবা অনুষ্ঠান উপলক্ষেই আহুত।

এই নৃত্যশালাটি কোন ঘরে নয় আগেই বোলেছি প্রাঙ্গণে, মুক্ত আকাশতলে, আর প্রায় সহস্রাধিক লোক বসে দেখতে পারে এমনভাবে এই বৃত্তাকার প্রাঙ্গণটি রচিত। চারিদিকেই যে বৃত্তাকার সাতটি সোপান সেখানে কোন আসন ছিল না তবে সেইখানে

অনেকগুলি শ্রমজীবী শ্রেণীর নরনারী বসে ছিল, যারা উচ্চ স্তরের বেশভূষায় ভূষিত ছিলনা। যাই হোক কোথাও ধূলা নাই ময়লা নাই, সভাস্থ আসন প্রত্যেকটি পৃথক। এক্ষেত্রে আজ এ সভায় সমাগম প্রায় পূর্ণাঙ্গই হোয়েছিল। দেখলাম যন্ত্রী ছিল প্রায় দশ, গায়ক বাদক নর্ত্তক নৃত্যকী নিয়ে প্রায় পঁচিশ জন। শ্রোতার মধ্যে নারীই সংখ্যায় বোধ হয় বেশী কারণ যেদিকেই দেখি, স্ত্রীমূর্ত্তিই চক্ষে পড়ে,—বালিকা বালক সব রকমই শ্রোতা সে আসরে ছিল। দুই চারটি ভারি সুন্দর পাকা আমটির মত বুড়ো ও বুড়িও ছিল।

যখন আমরা গেলাম তখন যন্ত্র সংগীতের সঙ্গে নাচ চলছিল। নাচের আসরের আগেই সংগীত হয়তো হয়ে গিয়েছে। সম্ভবতঃ আরম্ভে এক প্রস্থ সংগীতই হয়েছিল, মনে হয় তখন আমি দেবীর সঙ্গে মরকত মন্দিরে ছিলাম। প্রায় মধ্যাহ্নেই এখানে এসেছি তখন প্রায় আট দশটি যন্ত্রের সঙ্গে নাচ চলছিল। আসরের মধ্যে শ্রোতারা কেউ কেউ তার সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে গানও গাইছিল, তাতে কারো আপত্তি নেই কারণ তা তালে ও সুরে চমৎকার সাম্য রেখেই চলেছিল। যন্ত্রের মধ্যে দুইটি বীনা, লম্বা কাঠি দিয়ে বাজাতে হয় নৌকার মত আকার, চমৎকার কারুকলায় অলঙ্কৃত ঐ যন্ত্র দুটি;—তাঁতের কোন যন্ত্রের ব্যবহার দেখলাম না; প্রকাণ্ড একটি পান তার বোঁটার জায়গায় বেশ মোটা দণ্ড প্রায় দেড় হাত হবে উপর দিকে একটি মকরের মুখ তাতে পরদার ঘাট, পাশে তরফের তার এমনি ছিল দুটি যন্ত্র। একটি চৌকীর উপর বসে তারা বাজাচ্ছিলেন, আর ছিল বাঁশী দু রকম এক রকম সানাই-এর আকার কিন্তু ঐ রকম চেরা ঝাঁঝালো আওয়াজ নয়, ভারি নরম গোল আওয়াজ। আর এক রকম বাঁশের বাঁশী, খুব লম্বা আড় বাঁশী। সব বাঁশীই চমৎকার শিল্পপুতঃ;—কোনটির একদিকে মকরের মুখ শুঁড়তোলা, সোনার গড়ন অপূর্ব্ব কারুকলার নিদর্শন। মন্দিরা ছিল দুজোড়া দুজনের হাতে, তার শব্দও মিষ্ট। আশ্চর্য্য লাগলো আমার এইটুকু যে সকল যন্ত্র থেকেই কোমল ও মধুর ধ্বনী উঠছিল, কোন যন্ত্রই তীব্র ধ্বনী উৎপন্ন করেনি। এইভাবে সেদিন প্রায় সন্ধ্যার সময় আমার দেব বা গন্ধর্ব্ব সাথী উঠলেন;—কয়েকজন ওখানকার শ্রোতার সঙ্গে হাসাহাসি করে আমায় নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন এবং ঠিক আমার আশ্রয়দাত্রী দেবীর গৃহের সামনে ছেড়ে দিয়ে হাসি মুখেই যা বললেন বড় মিষ্টি। যাবার সময় বলে গেলেন, রাত্রে মন্দিরে নৃত্যগীত উৎসবে আমি যেন যাই। ভাষা বুঝলাম না তবে ভাবেই ঠিক বুঝলাম।

রাত্রে ভোজনের পর আমার আশ্রয়দাতা ও দেবী উভয়েই যখন মন্দিরে গেলেন আমাকেও সঙ্গে নিয়ে গেলেন। আমি গিয়ে প্রায় সারারাত্রই মন্দিরে কাটালাম স্বপ্নাবিষ্টের মত। মস্তিষ্কে আমার, এ স্বর্গের সূক্ষ্ম রস গ্রহণের যেন আর স্থান ছিলনা।

পরদিন প্রাতে দেবী প্রসন্ন বদনে আমাকে নিয়ে বসলেন,—আমার মুখের দিকে একটু রহস্যময় দৃষ্টিপাত করে যেন প্রশ্ন করলেন, আমার এমন ভাবটা কেন? কি হয়েছে আমার মধ্যে?

সত্যই আমার মধ্যে যে ভাবটা চলছিল আমার ভাবে আমার ভাষায় কোন রকম করে তাঁকে বুঝিয়ে দিতে পারবো কিনা এইটাই আগে হোলো আমার ভাবনা। কিভাবে বলবো? গতকাল থেকে যা কিছু দেখেছি শুনেছি, বিশেষতঃ ঐ দুই স্থানে নৃত্যগীতের যে রসমাধুর্য্য উপভোগ করেছি তারপর আজ সকাল থেকে যে একটা অবসাদ ভোগ করচি। মনে হচ্ছে যেন এখানে আমি আর থাকতে পারচি না;—অথচ জীবনে আমার কখনও যে সম্ভাবনা ছিলনা, সেই মহান, উচ্চ স্তরের সঙ্গ, দৃশ্য এবং মহৎ সংস্কৃতির চরম ফলসমূহ উপভোগ ঘটে গিয়েছে ঐ একদিনে ও রাত্রে জীবনে যা কখনও কল্পনা করিনি তা আমার অদৃষ্টে—কি মহা সুকৃতির ফলে জানিনা ঘটেছে,—কিন্তু তারপর এ কি অবস্থা হোলো আমার? যাই হোক আমি বুঝেছিলাম দেবীকে বুঝাবার আর দেবীর কথাও কিছু বুঝতে আমার পক্ষে কোন অসুবিধাই হবে না।

আট

সত্যই, এতটা আনন্দের প্রবাহ যার মধ্যে আমি কাল সেইক্ষণ থেকেই মগ্ন রয়েছি, তা সর্ব্বক্ষণই অনুভব করচি কিন্তু তা সত্ত্বেও এমন উচ্চতর অবস্থাও ক্রমে আমার দুঃসহ—যেন আর এখানে থাকতে পাচ্ছিনা, কেন এমনটা হয় দেবী?

দেবী প্রসন্ন বদনে বললেন,—এটি যে, আমাদের গন্ধর্ব্ব রাজ্য! গঙ্গাদেবীকে কেন্দ্র করে হিমালয়ের উচ্চ স্তরেই রয়েছে এখানকার মাটি, জল, বাতাস, ভৌতিক দেহের একান্ত প্রয়োজনীয় যা কিছু, তা নিম্নভূমির অধিবাসীদের পক্ষে একটু বিচিত্র হবে। বিশেষতঃ তোমাদের অভ্যস্ত স্থূল জগতের তুলনায় এ স্থানের সব কিছুই এমনই তরল, এমনই সূক্ষ্ম যার জন্য এখানে বেশীক্ষণ থাকা তোমার পক্ষে কষ্টকর। এটা সহ্য করতে না পেরেই এমনটা হয়েচে। এখন আসল কথাটা বলি শোনো। তোমার মধ্যে নবীন শক্তির উন্মেষ,—এখনও তোমার মধ্যে কুটিল, স্থূল, তোমাদের দেশীয় প্রথায় ব্যবহার-জগতের কঠিন আবরণ পড়েনি, একটি সরল ভাবের মূর্ত্তি দেখেই আমার স্বামীর এই ইচ্ছা হয়েছিল, তোমায় এখানে নিয়ে এসে অল্প কিছুকাল আমাদের অতিথিরূপে রেখেই তোমার অন্তরের কৌতুহল তৃপ্ত করে দেবেন। সেইজন্যই এতটা কাল তুমি থাকতে পেরেচো এখানে, আরও অল্পকাল থাকতেও পারো ইচ্ছা হয়তো। আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এখানে স্থূল বাহ্য জগতের কেউ বিশেষতঃ গঙ্গোত্তরীর দক্ষিণ প্রান্তের

কেউ এক মুহূর্ত্ত কালও থাকতে পারবে না। আমি বললাম, গঙ্গাদেবী আমাদেরও ত তীর্থ,—আমরাও,—

বাধা দিয়ে দেবী বল্লেন,—আহা সে তো তুষারময় পর্ব্বত শৃঙ্গটি থেকে যে প্রবাহ হিমালয়ের মধ্য দিয়ে দক্ষিণে বিন্ধ্যগিরি অতিক্রম করে পূর্ব্বদেশ দিয়ে সাগরে মিশেছে সেইনদী। তোমরা তার স্থূল রূপই দেখো আর আপনাদের সংস্কার অনুযায়ী স্থূল লৌকিক ভাবেই পূজা করো, তার মধ্যে একটা ভয়ঙ্কর ভাবের পৌরাণিক সত্য লক্ষ্য কোরে, সে সত্য সগর বংশের উদ্ধার। আসল স্থানে পৌছাতেও পারো না। কঠোর চেষ্টায় বহু পরিমাণ প্রাণশক্তি খরচ করে সেখানে উঠতে পারলেও কিন্তু সেস্থলে জীবিত থাকা মানুষের পক্ষে অসম্ভব।

আমি বললাম,—যে অদ্ভুত যোগাযোগে আমি এখানে এসে পড়েছি সে আমার পক্ষে কল্পনার অতীত,—এখানে যে আমার অহংকারে উৎপন্ন শক্তিতে আসা অসম্ভব ছিল এটা বুঝতে আমার কোন কষ্ট হয়নি। দেবী বললেন, এখানে কোন ঋতুর প্রভাব নেই, আনন্দময়, সেই কারণে কোন প্রকার আধিভৌতিক অবসাদ বা দুঃখও নেই কারো।

আমি বলে ফেললাম, তবে আজ প্রভাত থেকেই এভাবের অবসাদ আমার কেন? এখানে আসবার পর থেকে কাল পর্য্যন্ত খুবই সুখে ছিলাম। এখানকার সংগীত উপভোগ করেছি।

ঈষৎ হেসে দেবী বললেন,—তুমি এখানে যে নৃত্যশালায় এবং মন্দিরের মধ্যে সঙ্গীত-রস, সুরতরঙ্গ গ্রহণ করতে পেরেছো তা আমাদেরই ইচ্ছা প্রভাবে। শুনে বললাম,—কেমন করে তা সম্ভব হোল দেবী, আমার নিজ অধিকারেও তো কিছু অনুশীলন ছিল সঙ্গীতশাস্ত্রে? দেবী বললেন,—আমাদেরই ইচ্ছায় এখানকার সূক্ষ্ম প্রাণময় পরমাণুর গুণেই তোমার প্রাণময় কোষ পুষ্ট ও তারই ফলে তোমার ইন্দ্রিয়গ্রামের মধ্যে দিয়ে—প্রাণ ঐ সকল সূক্ষ্মভাব গ্রহণপটু ও সুর-তরঙ্গ অনুভূতির উপযুক্ত হয়েই তোমার মধ্যে ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিল বোলেই। না হলে এখানকার সূক্ষ্ম ভাবরাশি স্থূলবুদ্ধি মানুষের গ্রহণ করবার বস্তু নয়। এটা কেবল আমাদের প্রীতিপূর্ণ মনঃশক্তির সাহায্যেই সম্ভব। তারপর তুমি এখানকার নও তাই এখন এতটা প্রতিক্রিয়ার মধ্যে পড়েছো। এভাব শীঘ্রই কেটে যাবে।

আনন্দিত হয়েই বললাম, বুঝেচি দেবী! কিন্তু আরও একটা কৌতুহল আছে, আমরা ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ,—ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ধর্ম্মের মানুষ, আমাদের প্রতি আপনার এ অনুগ্রহ—কি করে সম্ভব হোলো, তাই ভেবে বিস্মিত হয়েছি।

দেবী বললেন,—আমাদের এখানকার প্রত্যেকেরই, আগন্তুক মানুষ, অভ্যাগত, বা অতিথির উপর একটা প্রবল আকর্ষণ আছে। তারপর এখানে নিম্নভূমির জীব খুব অল্পই আসতে পারে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কেন?

দেবী বললেন,—তাদের স্থূল দেহভাব জড়রূপের আকর্ষণ ও ইন্দ্রিয় সম্ভোগ তৃষ্ণা, রাগ, বিদ্বেষ, জড়বস্তুর উপরই অতিরিক্ত আসক্তি,আধিপত্য প্রিয়তা ;—আর তা এতই বেশী যে, সেইজন্যই তারা এ অঞ্চলে আসতে বা থাকতে পারেনা। তা ছাড়া পশুরাজ্যের উপর নিরন্তর আধিপত্যের ফলে, পশুদের তুলনায় তারা শ্রেষ্ঠ সুতরাং বড়ই সভ্য এই গরিমাই তাদের অন্ধ করে দিয়েচে। পশুবলই তাদের অবলম্বন, সাধারণের মধ্যে আধ্যাত্ম শক্তির সন্ধানই নেই তাদের, কাজেই পশুবলই তাদের সম্বল। এমন কি ঐ শক্তিতেই তাদের দেশে সর্ব্ববিধ কর্ম্ম চলে। আবার পাশবিক ভোগ না হলে তাদের সুখও নেই। পশু সমাজের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ বড় গভীর। পশু সমাজই তাদের লক্ষ্য। ধরিত্রীর কোলে স্থলভাগে যত পশু আছে, খাদ্যরূপে যেগুলি ব্যবহার সম্ভব সেগুলি ছাড়া উচ্চ স্তরের মাংসাসী পশুদের লোপ করে দিতে পরম উৎসাহশীল ; খাদ্য হিসাবে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ যেন না থাকে যেহেতু তারাই শ্রেষ্ঠ মানব এই বোধ। অপরাপর উন্নত পশু নিরামীষাশী যারা তাদের যে কোন কাজে নিজেদের স্বার্থ সাধনে নিযুক্ত রাখা যায় সে দিকেই তাদের তীক্ষ্ণ লক্ষ্য। পক্ষি জাতীয় দিকেও সেই দৃষ্টি। জলচরদের উপরেও তাই,মাছ তো স্বাভাবিক ভোজ্য। অন্য বড় বড় সামুদ্রিক জীব দেখা আর মারা। বড় বড় বিশালকায় সামুদ্রিক জীব, তাদের তেল দরকার ; মারো তাদের। বুদ্ধিজ্ঞান ও অধ্যবসায়ের সীমা নেই, জীব হিংসার জন্য কতো কতো আবিষ্কার ফলে নিজেদের মধ্যেই হত্যার আনন্দ। স্থান অধিকার আর হিংসাই তাদের চরম সুখ। তাদের স্বার্থের পরিপন্থি এ বিশ্বজগতে কেউ না থাকে। ভারতের মধ্যেও ঐ বুদ্ধি সংক্রামিত হয়ে তাদের মধ্যে টেনে এনেছে এক শ্রেণীকে। ঐ পশুত্ব সর্ব্বস্ব বুদ্ধি আজ জগতের চারদিকেই ফুটে উঠেছে। যন্ত্রের গতিনির্ণয় তাও ঐ পশুর গতির আদর্শে,—মোট কথা সর্ব্ববিধ ব্যবহারে পশুত্বই তাদের যেন আদর্শ। অবশ্য এইভাবই ঐ সমাজের অধিকাংশ জন-সমষ্টির মধ্যে প্রসারিত। যারা সৎমার্গের মানুষ তারা এর প্রতিবাদ করে,—কিন্তু তাদের হিতবাণী সমষ্টির কানে পৌছায় না।

দেবী কতক্ষণ বিমনা হয়ে রইলেন, তারপর আবার বললেন,—এতটা স্থূল বুদ্ধি তাদের, মধ্যে মধ্যে এই হিমালয় তুষার শৃঙ্গ অতিক্রম করাটা একটা বড় গৌরবকর্ম্ম মনে করে। পশু-পক্ষিকে অবলম্বন করেই তারা গতি পায়। জানেনা ঐ দ্রুত গতিই তাদের দ্রুত ধ্বংসের পথে টানবে। মানুষের স্থূল চলাচলের গতি, জল, স্থল, অন্তরীক্ষ পথের দূরত্ব দ্রুত অতিক্রমেই তাদের আনন্দ, যেন সকল পুরুষার্থ প্রয়োগ করে প্রকৃতির

বিরুদ্ধে যাওয়াটাই মনুষ্যত্ব। পূর্ব্বকালে এই ক্ষেত্রেই দেবী চণ্ড ও মুণ্ডকে বধ করেছিলেন। তখন, তাদের বধের আশু প্রয়োজনের কথা বোলতে দেবী বলেছিলেন তার কারণটা। সেটি আর অন্য কিছু নয়,—তারা অর্থাৎ ঐ চণ্ড মুণ্ড মহাপশু হয়ে উঠেছিল। মানুষ ও দেব সমাজে তাদের উৎপীড়ন হয়ে উঠেছিল অসহ্য। ঠিক সেই ভাবেরই উৎপীড়ন চলচে তোমাদের মানুষ সমাজে; ঐ মহাপশুদের অত্যাচারে সমাজ উচ্ছৃঙ্খল, শান্তিহীন সৎমার্গের শান্তিকামী যারা তাদের শান্তি নেই স্বস্তিও নেই।

কতটা স্বল্প এবং মৃদুভাষী দেবী আজ মানুষের দুর্গতিতে ব্যথিতা হয়ে এতটা মুখরা হয়েছেন এই কথা ভেবে আমার অন্তরে একটা রোদনের ভাব ঠেলে উঠছিল। কিন্তু দেবীর সামনে আমি সংযতই ছিলাম। এখন একটু থেকে আবার বললেন,—

পশুগতি, পশুমতি, পাশবিকতাই তাদের বীরত্ব, শৌর্য্যবীর্য্য সব কিছু। পশু-পক্ষি হনন, তাই আহার, তাইতেই পুষ্টিবোধ, না হলে দুর্ব্বলবোধ এই সকল হীন সংস্কার। নিজ শক্তির দম্ভে তাদের লক্ষ্যই নেই যে তাদের কোন স্তরে নিয়ে যাচ্ছে। এইসব মিলে স্থূল-বুদ্ধি গর্ব্বিত মানুষ, যখন তুলনা করে তখন ঐ পশুজাতির সঙ্গেই নিজেকে তুলনা করে থাকে।

আমি বললাম,—কেন এমন হয় দেবী?

দেবী বললেন,—মানুষ-সমাজের মধ্যেই যারা অত্যন্ত নিম্নস্তরের, প্রথম মানুষ-জীবন পেয়েছে বন্য পশু প্রকৃতির, তাদের সঙ্গেই তুলনা করে নিজেদের ঐ পশুদের চেয়ে বড়ই দেখে এবং বড় মনে করে। এইভাবেই কেবল নিম্নস্তরের জীবের সঙ্গে নিরন্তর ব্যবহার, তাদের নিজেদের স্বার্থ সাধনের কাজে লাগানো এবং তুলনার ফলে মানুষ-সমাজ অধোগতি এড়াতে পারে না। যদি উচ্চস্তরের জীব-সমাজের সঙ্গে পরিচয় থাকত, তাদেব সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনার সুযোগ পেলে তখন নিজের অবস্থাটি কিরূপ তা বোঝবার অধিকার হোতো। নিজ সমাজের মধ্যে যারা উচ্চস্তরের পুরুষ বা নারী তাদের তারা দেখতেই চায় না। মতামতেব আবর্ত্তে পড়ে নিজের উপর বিশ্বাস হারায়, তা হারাবার জন্যই সাধারণতঃ মানুষ স্থূল বুদ্ধি স্বার্থপর, নিম্নগামী বুদ্ধি নিয়ে এই সৃষ্টির মধ্যে নিরন্তর অশান্তি আগুন জ্বালিয়ে রেখেচে বরাবর, আর সুখের আশায় এদেশ-ওদেশ করে শান্তিহীন, অস্থির, চঞ্চল হয়ে ছুটে বেড়াচ্চে। আর না হয় শক্তিহীন হয়ে নিজ সমাজ বা পরিবারে মহা অশান্তির কারণ হয়ে—আত্মোন্নোতির পথ রোধ করে ফেলচে।

দেবী আবার কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে আবার বললেন,—মানুষের এই ভাবের অধঃপতন দেখে তাদের এই বিকৃতি, আমাদের মধ্যে একটা

অনুকম্পা জাগায়। যার ফলে আমরা তাদের মধ্যে সূক্ষ্ম অনুভূতি রসবোধ, প্রীতি ও প্রেম জাগিয়ে তাদের ঐ ক্ষুদ্রতা নাশ করে মহৎ ভাবে উদ্দীপ্ত করতে একটা প্রেরণা অনুভব করি। মানুষ মাত্রই দয়ার পাত্র এ বোধ প্রত্যেক গন্ধর্ব্বের সংস্কারগত। এমন কি জন্মগত সংস্কার বলা যায়।

আমার কানের মধ্যে দিয়ে এই সকল কথা প্রাণে পৌঁছে একের পর এক সত্যকে জাগিয়ে তুললে। হায় হায়, এটা কি কঠিন সত্য ; এঁদের তুলনায় মানুষ-সমাজ কোন নিম্নস্তরেই না পড়ে আছে , পশুরা মানবের কত নীচে কিন্তু আজ মানুষ পশুর পর্য্যায়ে নেমে এসে কি দুঃখ ভোগ করচে। আমার মনে হোল দেবী যেন স্নেহবশেই এই সকল আমাদের কল্যাণের জন্যই প্রকাশ করচেন। কিন্তু এই দেবলোকবাসীদের স্নেহ, মমতা, সঙ্কোচ, লজ্জা, ঘৃণা, এ সকল ক্ষুদ্র মনোবৃত্তি তো থাকেনা। অবশ্য এটা পূর্ব্বাপর শোনা কথা। উচ্চভূমি বা লোকের অধিবাসিদের মানব-সমাজের দুর্ব্বলতা তো থাকেনা এই কথাই তখন মনে মনে তোলাপাড়া করছিলাম।

আমার মনের কথা জানতে পেরেই প্রীতিপূর্ণ নয়নে আমার দিকে চেয়ে দেবী বললেন,—সত্য, আমাদের তা নেই তবে আকর্ষণ আছে, কারণ সেটি বিশ্ব জগতের ধর্ম্ম। আমাদের মধ্যে সহজভাবেই এই সংস্কারটি থাকে যে, যার সেটি অভাব তাকে সেইটি দিয়ে সার্থক করাই আমাদের অস্তিত্বের প্রধান কথা। অতিথি-সৎকারের মধ্যে দিয়েই আমরা তা করে থাকি। ঠিক নিচের দিকে আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী হোল মানুষ। আর ঠিক উপরের নিকটতম সৃষ্টি হোল দেবলোক। আমরা এই দুই লোকের মধ্যেই আছি।

এই দুই স্তরের সঙ্গেই আমাদের আদান-প্রদান চলে। তার মধ্যে মানুষের সম্বন্ধই ঘনিষ্ঠ, কারণ, প্রকৃতির নিয়মে মানুষ-সমাজ আমাদের দানেই পুষ্ট হয়, উন্নত হয়, সংস্কৃতিবান আর ধন্য হয়,—আর সেইজন্যই আমাদের উপাসনা করে। কাব্য, সাহিত্য, সঙ্গীত নৃত্য, চারুচিত্র ভাস্কর্য্য প্রভৃতি চৌষট্টি কলা, তারা জানেনা যে, আত্মার আনন্দময় অস্তিত্বের এই সকল বিকাশ আমাদেরই অনুগ্রহে তারা পেয়ে আসচে,—অতি প্রাচীন-কাল থেকেই। কিন্তু এইসব কলাবিদ্যার অধিকারে খুব কম মানুষই এর পবিত্রতা শেষ পর্য্যন্ত রাখতে পারে, সিদ্ধি লাভও খুব কম লোকেরই হয়ে থাকে।

আমি এই সত্য মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করে তখনই বললাম,—কেন এমন হয় দেবী ? ইচ্ছা থাকলেও ঠিক পবিত্র কেন আমরা হতে পারি না ?

দেবী বললেন,—অহঙ্কার, গর্ব্ব, ঈর্ষা, দ্বেষ এই চারটি মহৎ দোষ সকল ক্ষেত্রেই মানুষের অস্থি মজ্জাগত। যোগ্যতার পুরস্কার বলে এইগুলিকে সমাজের মধ্যে ব্যবহার-

ক্ষেত্রে উপযোগী করে নিয়েচে। এই দোষ ক'টির প্রভাবে তারা কোনরূপে কোনকালেই ক্ষুদ্রতার সীমা ছাড়াতে পারে না। কোনও গুণ অথবা বিদ্যার প্রসার কোন গুণী বা কোন বিদ্বান আন্তরিক চায় না। মানুষ-সমাজে সর্ব্বজনকাম্য বস্তু একমাত্র সুবর্ণ। এই সুবর্ণকে কেন্দ্র করেই সভ্যতা, তাদের সকল ঐশ্বর্য্য, ব্যবসায়, শিল্পের প্রসার। অদ্ভুত! খনিজ এই জড়পদার্থকে অবলম্বন করেই জড়ীভূত বুদ্ধির ইতিহাস, সভ্যতার উৎকর্ষ বোলে প্রকাশ ও প্রচার, এরই গর্ব্ব ও দম্ভ মানুষের মধ্যে! ঐটিতে যার যত অধিকার, মানুষ-সমাজে সে ততই বড়ো।

আমি এখন আবার বললেম,—দেবী! মানুষ-সমাজেরই তো আমরা, এমনভাবে দেখিনি তো এই অদ্ভুত সত্যকে। জ্ঞান-বিদ্যার গর্ব্ব করে থাকি, রাজসভায়—বিচার ক্ষেত্রে—

বাধা দিয়ে দেবী বললেন,—জ্ঞান-বিদ্যার ক্ষেত্রে এই মানুষের ক্ষুদ্রতা বিস্ময়কর। আমার চেয়ে কেউ বড় না হয়, এই মনোভাবই সকল তপস্যার মূলে বর্ত্তমান থাকে এদের। একজনকেই শ্রেষ্ঠ গণ্য করে সম্মান, পুরস্কারাদি দ্বারা তাকে আবদ্ধ করে এরা সকল বিদ্যা-প্রসারের পথ কণ্টকিত করে রাখতে ভালবাসে। আরও আশ্চর্য্য, এইটিকেই আবার প্রসারের পথ মনে করে। পুরস্কারলুব্ধ হয়ে অনেকেই এই বিদ্যা গ্রহণ করবে—এইভাবেই লুব্ধপ্রবণতা প্রসারিত হয়ে থাকে তাদের মধ্যে। ফল হয় ঠিক বিপরীত। এইভাবে সঙ্কীর্ণতায় অভ্যস্ত, ধন বা সুবর্ণ লোভ সর্ব্ববিধ মহৎ প্রসারের বিরোধী, মহৎ সম্ভাবনার প্রতিকূল। পশুশক্তিতে প্রবল আস্থা যেখানে,—কল্যাণ কোথায় থাকতে পারে? সেই মানুষ-সমাজে সূক্ষ্ম আনন্দরস কেমন করে প্রসারিত হতে পারে? তাই মানুষের মধ্যে উচ্চ আধার, সরল, নির্ম্মল-চিত্ত নবীন কাকেও পেলে তাকে আমরা আকর্ষণ করি;—তাকে বিকারমুক্ত করে, পবিত্র আনন্দময় তত্ত্বপ্রসারে উচ্চতম মার্গের পথ নির্দ্দেশে সহায়তা করে তাদের জন্ম ও জীবন সার্থক করতে। কোন মানুষের মধ্যে এখানকার রসবোধ এবং সূক্ষ্ম অনুভূতি জাগলে, সেটা অশেষ কল্যাণকর হয়।

নয়

আমার যে দৃষ্টি আজ খুলেচে, তা যেন এমনই খোলা থাকে। এই কথা কয়টি বোলে আমার যেন সজ্ঞালোপ হয়ে গেল। মনে হয় কতক্ষণ অচৈতন্য হয়েই ছিলাম। এখন চক্ষু খুলতেই দেখি দেবী,—এগিয়ে এসে সস্নেহেই আমার বাহুমূল স্পর্শ করলেন তিনি যেন আমার চৈতন্য সঞ্চারের অপেক্ষাই করছিলেন। এখন বললেন,—কি হয়েচে

তোমার ? বলে আমাকে বাহুবেষ্টনে আবদ্ধ করলেন। তারপর বললেন,—চিন্তা নেই, একটা আনন্দের তরঙ্গ এসেছিল,—তার বেগ ধারণ করতে পারো নি।

তারপর দেখলাম,—দেবীর প্রসন্ন বদনে বিজলীর একটা আভা যেন খেলে গেল। তিনি বললেন,—বলত এবার! সত্য করে মনের কথাটা তোমার? বললাম, দেবী! আর আমার দেশে ফিরে যেতে ইচ্ছা নেই, সে অপবিত্র স্থানে, বিকৃত লোকসমাজে আমি যেতে চাই না। এখন আর কোন অবসাদ আমার নেই সত্যই এখানে থাকতে চাই। অথচ এখানেও আপনাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে থাকবার উপায়ও নেই। আমাকে কৃপা করুন দেবী। আমি অকিঞ্চন, এখানে আমার নবজন্ম হয়েচে।

দেবী বললেন, যেতে তোমাকে হবেই, প্রকৃতির নিয়মেই যেতে হবে কারণ সশরীরে যে এখানে এসেচো। এখানে যারা বাইরে থেকে আসে তাঁদের যেতে হবেই যে। এমন কি দেহত্যাগও হবে না এ গন্ধর্ব্ব ক্ষেত্রে। কেবল তাদেরই যেতে হয় না এখান থেকে, গুণগত ঐক্যর জন্য যাদের আমরা সঙ্গে রাখতে চাই। অবশ্য তাদের কল্যাণের জন্যই এখানে রাখা। তারা এখানকারই সত্তা বোলে তাই তারা একত্র আমাদের সঙ্গে এ-সমাজে থেকে যেতে পারে। তাদের এখান থেকে যাবার প্রবৃত্তিও হয়না। বিশেষতঃ আমরা তাদেরই এখানে আনি যাদের ওখানকার ভাই, বোন. মা, বাপ, বন্ধু অথবা ধনৈশ্বর্য্যের কোন আকর্ষণই বা বন্ধন থাকে না। তোমার পক্ষে ওখানকার সম্বন্ধ হোলো জন্ম থেকে ;—পারিবারিক ধারা বা বংশক্রমে। আমরা তা কল্পনাও করতে পারি না। এখানে বংশ আপনপর বা পৃথকধারা এসব নেই।

আমি বললাম, কেন দেবী আপনাদেরও পিতা, মাতা, ভাই, ভগ্নী আছেন। দেবী বললেন,—তা আছেন প্রাকৃতিক সৃষ্টির নিয়মেই, কিন্তু আমরা তাদের জন্য পৃথক আকর্ষণ অনুভব করি না যেমন তোমাদের মানব-রাজ্যে ইন্দ্রিয় সম্ভোগ উন্মাদনার প্রভাবে জন্মের ফলে হয়ে থাকে। তোমাদের দেশে যেমন জন্মগত রক্তের সম্বন্ধই বড় বা প্রধান, বাকি সবাই পর ;—এখানে সবাই গন্ধর্ব্ব। আমাদের শরীরের ধাতুই আলাদা, জন্ম প্রকারান্তর পৃথক। এক গন্ধর্ব্ব সত্তায় সবাই আমরা বাঁধা। এখানে ইন্দ্রিয়সুলভ যথেচ্ছাচার ভ্রষ্টাচার এসব নেই। এক গন্ধর্ব্ব জাতি এক লোক—পার্থক্য আর বন্ধন কোনটাই নেই। সম্বোধনে ভিন্ন প্রকারের বাবা, মা, দাদা, দিদি এসবই আছে। তোমাদের তা সহজে ধারণার কথা নয় সম্ভাবনাও নেই। ওরাই আমার আপন, আর সবাই পর, এসব ভাব এখানে সত্য নয়। এখানে মূল আকর্ষণের কারণ ঘটে, মাত্র কোন গন্ধর্ব্ব স্ত্রীপুরুষের মধ্যে, যখন তাদের মধ্যে আত্মদান প্রেরণা আসে সৃষ্টির উপযুক্ত হলে।

তবুও আমার আকর্ষণ ক্ষীণ হলনা তাই আবার বললাম,—কিছুতেই আমার

আর দেশে ফিরে যেতে ইচ্ছা নেই, আমায় রক্ষা করুন দেবী!—আমি আত্মসমর্পণ করছি।

কিন্তু যেতে হবেই। আপন ভাবের প্রভাবেই যেতে হবে, যতদিন তা না হয় ততদিন নিঃসঙ্কোচে থাকবে আমাদের অতিথি হয়ে।

কেন আমি এখানে আজীবন থাকতে পারব না দেবী?

দেবী বললেন,—গুণগত বৈষম্যের কারণ, দীর্ঘ স্থায়ী হতে পারে না এখানে থাকাটা, তোমার নিজ ইচ্ছাশক্তির উপর আমাদের সমর্থন পূর্ণভাবে না থাকলে এখানকার প্রভাব কাটালেই ওখানকার স্থূল গুণগত আকর্ষণগুলি মাথা তুলবে, তখন এ ভূমি কলঙ্কিত হবে,—যেটা দু'পক্ষেই ক্ষতিকর। তাছাড়া,—এইটুকু বোলেই তখনই দেবী নির্ব্বাক হলেন। আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম,—আরও কিছু আছে নাকি?

আপন পিতার বা পিতৃপুরুষের জলপিণ্ড বিলোপন হবে এখানে থাকলে, তোমার মাতা-পিতার যে আকর্ষণ আছে তোমার উপর, তা কাটাবে কি করে? তিনি যে কিছুতেই তোমাকে ত্যাগ করতে পারবেন না। ভবিষ্যতের অনেক কিছু আশা ভরসা নির্ভর করছে তোমার উপর।

এটা তোমাদের দেশেরই সামাজিক নিয়ম শুধু নয়, অস্থি মজ্জাগত সংস্কার। কেমন করে তা কাটাবে বলো? তোমাকেও যে ঐ ক্রমেই জীবন-কর্ম্ম সম্পূর্ণ করতে হবে,—আর তোমাদের জন্ম ও জীবনগত সকল ঋণও শোধ করতে হবে,—মাতৃ-ঋণ, পিতৃ-ঋণ, দেব-ঋণ, ঋষি-ঋণ এসব আছে তো?

আমি নির্ব্বাক,—এতক্ষণ মনের যেভাব নিয়ে কথা কইছিলাম এখন আর সেপ্রভাব রইলো না। দেবীর দুর্নিবার ইচ্ছার প্রভাবেই আমার তখন মনোভাবের পরিবর্ত্তন হোলো। বেশ বুঝলাম,—আমি এই দেব-ভূমিতে দীর্ঘকাল থাকবার উপযুক্তই নই, একথা সত্য। মানব শরীর নিয়ে যেমন স্বর্গে বাস অসম্ভব এটা ঠিক প্রাকৃত নিয়মেই সত্য।

দশ

লণ্ডন, প্যারী, নিউইয়র্ক অথবা চিকাগো দর্শন নয়,—ইচ্ছা হলে আর ধন থাকলে মানব অধিকারের সহজ নিয়মেই বাসের যেমন প্রতিবন্ধক নেই সে রকম ভূমি এটা নয়। এখানে আসা যাওয়া—একজনের নিজ ইচ্ছার উপর নির্ভর করেনা অথবা ধনৈশ্বর্য্যের প্রভাব এখানে কোন কাজই করেনা। তবে আমার আরও একটা কথা মনে হোলো। এভারেষ্ট এক্সপিডিসান এখনও শেষ হয়নি, হাজার খানেক ফিট্ বাকী আছে,—

কোনদিন ঐ পশ্বাদর্শবাদিরা কোন না কোন উপায়ে হয়তো তাদের দাম্ভিক বিজয় কেতন উড়িয়ে আসবে বোধ হয় গৌরীশঙ্করের ধবল শীর্ষে ; একেবারে দৃঢ় প্রোথিত না করতে পারুক। প্রকৃতি জননীর অদ্ভুত খেয়ালের ফলে আজ কোন পাশ্চাত্য ভবঘুরে যদি এই অ-মানবের দেশে এসে পড়ে তুষার ভূমির উপর গাঢ় প্রীতির বসে, এ অঞ্চলে অভিযানের ইচ্ছায়,—একবার দেখেশুনে যাবার পর এ ভূমির গুহ্য রহস্য তখন কি আর গুহ্য থাকবে ? জানিনা সত্য এ রকম কিছু ঘটবে কি না। গঙ্গোত্রী গ্লেসিয়ার অতিক্রম করে আজ পর্য্যন্ত কেউ উত্তর প্রান্তে কোন গিরিসঙ্কট উত্তীর্ণ হয়ে তীর্ব্বতের দিকে নামতে পেরেছেন বোলে শুনিনি। তাই মনে হয় কোন সুদূর বা অদূর ভবিষ্যতে এ ভূমির সন্ধান ভারত-সমাজের তথা জগতের সন্ধানে আসা অসম্ভব নয় বিশেষতঃ এই অন্তরীক্ষ অভিযানান্ত প্রাণ আধুনিক দুঃসাহসী বিমান জীবিগণের অধ্যবসায় ক্ষেত্রে। এখানে ল্যাণ্ডিং-এর কোন বাধা নেই। তবে আকাশ থেকে সর্ব্বত্র তুষার ভূমিই দেখায় মরকতরাজ্যের প্রধান নগরটিব সর্ব্বত্র, সেটাই বর্ত্তমানে আত্মরক্ষার কবচ,—কিন্তু দীর্ঘকাল রক্ষা করতে পারবে কি পরদেশীয় শ্যেনদৃষ্টি, অথবা আগমন বা আক্রমণ থেকে।

এখন আরও খানিকটা শক্তি ও সংযমের অধিকারী হয়ে আমি আরও একটি দিন এখানে থেকে অনেক কিছু দেখলাম ও শুনলাম। এক্ষেত্রে আর সে সব না বোলে আমার আশ্রয়দাতা বাসুদেব ও তাঁর সঙ্গিনী, যাঁকে দেবী বোলেই বর্ণনা করেছি গুর্ব্বী, তাঁর নামটি শুনেছিলাম। তাঁদের কৃপায় আমি শেষ যেটুকু পেয়েছিলাম তাই বোলেই এ পালা শেষ করবো। ভগবৎ কৃপা এমন করেই আমার এই অসম্ভবের পথে যাত্রা সফল করেছিল। অন্তর্য্যামী বাসুদেব সেই তুষার প্রান্তরের মাঝে আমায় দেখেই বুঝেছিলেন যে গঙ্গার উৎপত্তিস্থল খুঁজতে গিয়েই আমি পথ হারিয়ে মাথা খারাপ করে দেহ-নাশের নিশ্চিত সম্ভাবনার মধ্যেই পড়েছিলাম, তিনি শুধু আমার দেহটি রক্ষা নয়, অকথ্য, অসাধারণ আর অনির্ব্বচনীয় এবং অপরিশোধনীয় ঋণে আমায় আবদ্ধ করে তিনটি দিন তিনটি রাত্রি গন্ধর্ব্ব নগরে অতিথিরূপে বাসের পর ঐ ভাগীরথীর উৎপত্তিস্থল দেখিয়ে তারপর অতি সহজেই সাধারণ সহজ পথে আমায় পৌছে দেবার চমৎকার ব্যবস্থা করলেন।

চতুর্থ দিন প্রাতে প্রসন্ন মনে দেবী আমার কাছে এলেন একদিকে স্বামী বাসুদেব অপরদিকে সেই যুবা দ্বিতীয় দিনে যিনি আমায় নৃত্যশালা দেখিয়েছিলেন, নাম তাঁর মকরন্দ। দেবী আমায় তাঁর হাতে দিয়ে চলে গেলেন তাঁর স্বামীর বাহু অবলম্বনে।

* * * * *

দূরে দেখলাম তুষারাবৃত বিশাল পর্ব্বত,—সম্মুখে, বহুদূর বিস্তৃত তুষার ভূমি,

গ্লেশিয়ার,—ধীরে ধীরে সেই শুভ্র তুষারমরু ক্রমোচ্চ গতিতে সেই পর্ব্বতের পাদমূল পর্য্যন্ত গিয়েছে। আমার সাথী বললেন, হে আমার ভারতীয় বন্ধু—বাসুদেব স্বামীর

মুখে শুনেছি তুমি এই ভূমির দক্ষিণে ভাগীরথীর উৎস সন্ধানেই এসেছিলে, মধ্যপথে পথভ্রান্ত, ক্লান্ত এবং দিশাহারা হয়ে তুষার প্রান্তরে একক বিশেষ বিপন্ন হয়েছিলে তখন

আর্য্য দেবস্বামীর সঙ্গে দেখা হয় তিনি তোমায় অলকায় নিয়ে এসেছিলেন, যেহেতু তিনি লক্ষ্য করেছিলেন তোমার লক্ষণে এখানকার কিছু চিহ্ন ছিল,—তাই তিন দিন অতিথিরূপে এখানে বাস করতে পেরেছিলে। এখন আজ্ঞা হয়েছে আজ এখান থেকে তোমায় মন্দাকিনীর, তথা ভাগীরথীর উৎস দেখিয়ে সহজ পথে যথাস্থানে পৌছে দিয়ে আসতে। এখন দেখ আমাদের ঐ সম্মুখেই বিস্তৃত ধবল তুষার প্রান্তরের ঐ পর্ব্বত ঐখানেই ভাগীরথীর উৎসমুখ। কিন্তু এখানে দেখবে তুমি মাত্র ঐটুকু ধারা, তারপর নির্ঝরিণী ঐ প্রবাহ তুষারে ঢাকা, দীর্ঘ তুষার ভূমির তলে তলে প্রবাহিত ঐ গোমুখ গুহা পর্যন্ত অদৃশ্য, আবার ঐ তুষার ভূমির প্রান্তের ঐস্থান থেকেই ভাগিরথীর মুক্ত-কায়ার দর্শন সুলভ হয়েছে। চলো দেখবে।

সাথী আমার হাত ধরলেন,—যাতে তুষার ভূমির ক্রমোচ্চ আরোহণেই পথে চলা সহজ হলো আমার পক্ষে। এমন সহজ হোলো ঠিক যেমন কয়েকদিন আগে বাসুদেব যখন আমায় ধরে ঐ তুষার ভূমিতে প্রাণরক্ষা করেছিলেন সেইরূপ। প্রায় এক থেকে দেড় মাইল হেঁটে ক্রমেই আমরা পর্ব্বতের পাদমূলে এসে পৌছালাম। তুষারের শেষ ক্ষেত্র। একটুও ধূলা নেই এখানে, অমল ধবল, তার পরেই আরোহণ। ঘুরে ফিরে এক একটি ক্রমোচ্চ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘন তুষার পিণ্ডের উপর দিয়ে দেব-সাথী মকরন্দের প্রভাবেই আমার গতি সহজ হতে পেরেছিল, না হলে এ সব ক্ষেত্রে কোন বিদেশীর পক্ষে ক্যাম্প, দলবল নিয়ে ধূমধাম কোরে রিপোর্টার ফটোগ্রাফার নিয়ে সংবাদ জগৎ আলোড়িত করবার কথা। আমরা প্রায় আরও—আধ মাইল চড়ে পর্ব্বতের অপর দিকে এসে স্কন্ধদেশে পৌছে গেলাম। স্ফটিক স্বচ্ছ নীলাভ আমাদের সম্মুখেই উচ্চ এক তুষার স্তূপের উপর একটি স্থান দেখিয়ে মকরন্দ বললেন,—দেখো মিত্র,—সার্থক করো যাত্রা তোমার।

বিশ বাইশ ফুট উঁচুতে একটি ধবল গো-মুণ্ড যেন গলা বাড়ানো অবস্থায়। একটি স্বাভাবিক গো-মুণ্ডের চারগুণ বড় হবে ধবল অসমান একটি তীর্য্যক প্রাচীর থেকে যেন বেরিয়ে এসেছে, আমরা প্রায় ত্রিশ হতে পঁয়ত্রিশ হাত দূর হতে দেখচি। সেই গো-মুখটি অল্পই হাঁ করা,—সেই হাঁ থেকে দ্রবিভূত তুষারের দুইটি অতীব ক্ষীণ দুগ্ধ ধবল ধারা প্রায় ছয় আট আঙ্গুল চওড়া অসমান একটি ধারা বা ঝরণারূপে প্রবলবেগেই পড়ছে সেই ধারা, প্রায় দশ বারো হাত নীচে এক গহ্বরে,—তারপর সবটাই তুষার-ঢাকা ক্রমনিম্ন ক্ষেত্র। মকরন্দ সমাহিত,—ধ্যান-স্তিমিত নয়নে দুই হাত জোড় করা, ধীরে ধীরে বললেন,—এই গো-মুখ! দুর্লভ দর্শন ভাগিরথী বা গঙ্গা, স্বর্গের সেই মন্দাকিনীর জন্মস্থান এই ধরাতলে। এখন চল প্রিয় তোমায় যথাস্থানে পৌছে দিয়ে আসি। হাতটি আমার ধরে তিনি নামতে আরম্ভ করলেন। এখান থেকে

যেতে প্রাণ চায় না। শরীর মন আমার, যেন আর আমার নয়, নেশার একটা ঘোরে অর্দ্ধ চেতন শরীর নিয়ে চললাম মকরন্দ দেবের শক্তিতে। তাঁরই টানে—তাঁরই পাশে পাশে। কিছু খেয়ে নাও বলে একস্থানে একটু দাঁড়ালেন হাতে কিছু দিলেন আমার, আমি তিন গ্রাস খেলাম, তারপর চললাম।

আমাদের অবতরণ, তারপর গঙ্গোত্তরী গ্লেশিয়ার অতিক্রম করে যখন সেই প্রকাণ্ড গুহা মুখে গঙ্গার কাছে পৌঁছালাম তখন তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হয়েছে ;—আমি তখন অনেকটাই জাগ্রত।

মকরন্দ বললেন,—চলো বন্ধু, তোমায় গঙ্গোত্তরী মন্দির প্রাঙ্গণে পৌঁছে দিতে হবে, দেবীর আদেশ।

ঠিক সন্ধ্যার মুখেই আমি যখন দূর থেকেই গঙ্গা মন্দিরের চূড়াটি দেখতে পেয়ে মকরন্দকে, যিনি আমার পিছনেই ছিলেন, বলতে গেলাম, দেখো বন্ধু! আমরা এসে গিয়েছি। কোথায় মকরন্দ ? আমার হৃদয় শূন্য করে তিনি অন্তর্দ্ধান করেছেন উপযুক্ত অবসরে আমায় নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিয়ে, শেষ একটা কথা বলবারও অবকাশ দিলেন না। অন্তরের কথা অন্তর্য্যামীই জানেন।

সমাপ্ত